POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ
هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۭ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ
مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ
ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا

তাহারা অবশ্যই কুফরী করিয়াছে যাহারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্- তিনিই মরিয়মের পুত্র মসীহ।' তুমি বল, 'আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় কাহার কি ক্ষমতা আছে, যদি তিনি মরিয়মের পুত্র মসীহ ও তাহার মাতাকে এবং যাহারা জগতে আছে তাহাদের সকলকে ধ্বংস করিতে চাহেন? (আল মায়েদা: ১৮)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly **BADAR** Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 44-45

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 2-9 Nov, 2023 17-24 রবিউস সানি 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

স্বামীর সম্পদ থেকে বিনা অনুমতিতে সন্তানদের জন্য ব্যয় করার অধিকার

২৪৬০) হযরত আয়েশা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হিন্দা বিনতে উতবা বিন রাবিয়া (আমাদের কাছে) আসে। সে বলে: হে রসুলুল্লাহ্! আবু সুফিয়ান ভীষণ কৃপণ মানুষ।আমি যদি তার সম্পদ থেকে আমার সন্তানদেরকে খাওয়ায় তবে কি আমার কোন পাপ হবে? আঁ হযরত (সা.) উত্তর দিলেন: তুমি যদি তাদেরকে রীতিমত খাওয়াও, তবে তোমার কোন পাপ হবে না।

প্রতিবেশীর অধিকার

২৪৬৩) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: কোন প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীকে তাদের প্রাচীরে খুঁটি পুঁততে যেন বাধা না দেয়।

কারো অধিকার খর্ব করার পাপ ও শাস্তি

২৪৫৮) হযরত উম্মে সালমা (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রসুলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর কক্ষের দরজায় কারো বিবাদের বিষয়ে শোনেন। তিনি (সা.) তাদের কাছে এসে বলেন: আমি একজন মানুষই। আমার কাছে এক পক্ষ আসে, তখন হতে পারে তোমাদের মাঝে কেউ অপরের চায়তে ভালভাবে নিজের স্বার্থের কথা আমার সামনে তুলে ধরে আর আমি মনে করে বসি যে সে সত্য কথা বলেছে আর তার বয়ান শুনে আমি তার পক্ষে বিচারের সিদ্ধান্ত দিই। তাই আমি যদি কোন মুসলমানের অধিকার (অন্যায্যভাবে) অন্য কাউকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত শোনাই, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, সেটা একটা আগুনের টুকরো যেটা তাকে দেওয়া হচ্ছে। চাইলে সে নিয়ে যাক বা রেখে যাক।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাযালিম)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১৪ আগস্ট ২০২৩

হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত

জলসা সালানায় প্রদত্ত ভাষণ

যে ব্যক্তি খোদার জন্য জীবন উৎসর্গ করে, সে কখন অসহায় অবস্থায় থাকে না। কখনোই নয়। বরং ধর্ম এবং আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গীকরণ মানুষকে বিচক্ষণ ও স্ফূর্তিবান করে তোলে, অলসতা তার কাছেও ঘেঁষে না। আমাদের নবী করীম (সা.) সব সময় অসহায়ত্ব ও অলসতা থেকে আশ্রয় চাইতেন। আমি পুনরায় বলছি, অলস হয়ো না।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

আললাহ্ তা'লা এই যে দোয় শিখিয়েছেন رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ (আল বাকারা: ২০২) এখানে জগতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জগত বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে? বলা হয়েছে জগতের কল্যাণসমূহকে যা পরকালে কল্যাণের কারণ হবে। এই দোয়ার শিক্ষা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, একজন মোমেনের উচিত জগত অর্জন করার ক্ষেত্রে পরকালের কল্যাণ দৃষ্টিপটে রাখা। সেই সাথে 'হাসানাতুদ দুনিয়া' শব্দবন্ধে জগতকে অর্জন করার সেই সমস্ত উৎকৃষ্ট পন্থার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যা একজন মোমেন মুসলমানের অবলম্বন করা উচিত। জগতকে এমন প্রত্যেক উপায়ে অর্জন করা- যে উপায়ে কেবল কল্যাণ লাভ হয়, সেই উপায়ে নয় যা মানবজাতির কষ্টের কারণ হয় বা সমগোত্রের মধ্যে কোন প্রকার সংকোচ বা লজ্জাবোধের জন্ম দেয়। এমন জগত অবশ্যই 'হাসানাতুল আখেরা' (পরকালের কল্যাণ) এর কারণ হবে।

অতএব, স্মরণ রেখো! যে ব্যক্তি খোদার জন্য জীবন উৎসর্গ করে, সে কখনো অসহায় অবস্থায় থাকে না। কখনোই নয়। বরং ধর্ম তথা আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গীকরণ মানুষকে বিচক্ষণ ও স্ফূর্তিবান করে তোলে। অলসতা তার কাছেও ঘেষে না। হাদীসে আম্মার বিন খুজাইমা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.) আমার পিতাকে বললেন, তোমাকে নিজের ক্ষেতে গাছ লাগাতে কোন জিনিসটি বাধা দিয়েছে? আমার পিতা উত্তর দিলেন, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, কাল মারা যাব। হযরত উমর (রা.) বললেন, তোমার অবশ্যই গাছ লাগানো দরকার। এরপর আমি হযরত উমরকে দেখেছি তিনি নিজে আমার পিতার সঙ্গে আমাদের বাগানে গাছ লাগাতেন আর আমাদের নবী করীম (সা.) সব সময় অসহায়ত্ব ও অলসতা থেকে আশ্রয় চাইতেন। আমি পুনরায় বলছি, অলস হয়ো না। আল্লাহ্ তা'লা পার্থিব উদ্দেশ্য অর্জন করতে বাধা দেন না। বরং 'হাসানাতুদ দুনিয়া'-র দোয়া শেখান। আল্লাহ্ তা'লা চান না মানুষ অসহায় হয়ে বসে থাকুক। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى (আন নাজাম, আয়াত: ৪০) তাই মোমেনের উচিত সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। কিন্তু আমি যতবার পারি একথাই বলব যে, জগতকে নিজেদের পরম উদ্দেশ্য জ্ঞান করো না। ধর্মকেই নিজেদের পরম উদ্দেশ্য জ্ঞান করো এবং পার্থিব উপায় উপকরণকে ধর্মের সেবক হিসেবে কাজে লাগাও। অনেক সময় ধনীদের দ্বারা এমন কাজ সম্পাদিত হয় যা দরিদ্র ও বঞ্চিতরা করার সুযোগ পায় না। রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর যুগে প্রথম খলীফা যিনি একজন দক্ষ ব্যবসায়ী ছিলেন মুসলমান হওয়ার পর তিনি অতুলনীয় সাহায্য করেন আর তিনি সিদ্দীক নামে অভিহিত হন। তিনি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সব থেকে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন এবং খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হন।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৯৪)

স্বর্ণ-কঙ্কণ পরানোর অর্থ কি?

যদি এর দ্বারা জগতকে বোঝানো হয়ে থাকে তবে এর অর্থ দাঁড়াবে মুসলমানরা রাজত্ব লাভ করবে।

যদি এর দ্বারা পরকালের কথা বোঝানো হয়ে থাকে, তবে স্বর্ণ-কঙ্কণ বলতে পার্থিব স্বর্ণ-কঙ্কণ বোঝানো হতে পারে না। বরং বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হবে এই কথাই বোঝানো হবে।

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَاۗىِٕكِ ۭ نِعْمَ الثَّوَابُ ۭ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا

সৈয়্যাদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) কাহাফ এর ৩২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

স্বর্ণের কঙ্কণের উপর আপত্তি করা হয় যে, পুরুষদের জন্য স্বর্ণ কঙ্কণ পরা অবৈধ। এর উত্তর হল, যদি এর দ্বারা জগতকে বোঝানো হয়ে থাকে তবে এর অর্থ দাঁড়াবে তারা রাজত্ব লাভ করবে। স্বর্ণ কঙ্কণ পরিধানের অর্থ রাজত্ব লাভ। প্রাচীন যুগে রাজা-বাদশাহরা স্বর্ণ কঙ্কণ পরিধান করতেন। তাই এখানে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে রাজত্ব দেওয়া হবে। আর এর দ্বারা যদি পরকাল বোঝানো হয়ে থাকে তবে সেখানকার সব কিছুই তো আধ্যাত্মিক বা অপার্থিব বস্তু। সেখানে স্বর্ণ-কঙ্কণের অর্থ পার্থিব স্বর্ণ-কঙ্কণ বোঝানো হতে পারে না। বরং বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হবে এই কথাই বোঝানো হবে।

مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ অর্থাৎ সিল্কের কাপড় পরলে আরাম ও আনন্দ পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে সেখানেও এমন পোশাক দেওয়া হবে যার মাধ্যমে Avi vgI Avb›` j vf হবে।

আর এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, যারা এই সব বস্তু পাওয়ার যোগ্য

এরপর শেষের পাতায়....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

মহানবী (সা.) যে–সকল ঘটনা সম্পর্কে ভবিষদ্বাণী করেছিলেন সেসবের মধ্যে একটি অতি স্পষ্ট এবং অসাধারণ ভবিষদ্বাণী ছিল রোম বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী।

বদরের যুদ্ধের সঙ্গে রোমান সাম্রাজ্য বিজয়েরও একটা সম্পর্ক আছে।

এ ঘটনা মক্কার যুগের যখন উক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। মক্কার মুশরিকরা চাইত যে, পারস্যবাসী যেন রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে, কেননা তারা ও পারস্যবাসীরা মূর্তি পূজারি ছিল। পারস্যের লোক তথা ইরানের লোকেরা মূর্তি পূজারি ছিল, অগ্নি পূজারি ছিল আর মক্কার লোকেরাও মূর্তি পূজারি ছিল। তারা পারস্যের বিজয় দেখতে চাইত আর মুসলমানরা পারসিকদের বিরুদ্ধে রোমানদের বিজয় কামনা করতো কারণ রোমানরা ছিল আহলে কিতাব।

আরবের নিরক্ষর নবীর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে এবং যখনকিনা মুসলমানরা বদরের প্রান্তরে কাফিরদের পরাজিত করেছে ঠিক সেই সময়ই রোমানরা পারস্যবাসীদের ওপর বিজয় লাভ করেছে। রাজত্বের পূর্বাঞ্চলের হারানো প্রত্যেকটি শহর পুনরায় হস্তগত করেছে আর পারস্যবাসীদের বসফরাস ও নীলনদের কিনারা থেকে হটিয়ে পুনরায় দাজলা ও ফুরাতের উপকূলের দিকে ঠেলে দেয়।

বর্তমান যুগ সম্পর্কে কুরআন করীমে যে–সব ভবিষ্যদ্বাণী আছে তা দেখা উচিত। পিতামাতারা কুরআন করীম পাঠ করুন এবং এরপর নিজেদের সন্তানদেরও ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ দেখান যে, এগুলো ইসলামের সত্যতার কত অসাধারণ প্রমাণ। ইসলামের সত্যতার প্রমাণ তো অসংখ্য। সুতরাং আমাদের অর্থাৎ পিতামাতা এবং তরুণদেরও জ্ঞান বৃদ্ধি করা জরুরি।

এই ভবিষ্যদ্বাণীর বিশেষত্ব হল, যদি পরাজয়ের সূচনার বছর থেকে বিজয়ের সূচনার বছর পর্যন্ত হিসাব করা হয় তাহলে নয় বছর হয়। আবার পূর্ণ পরাজয়ের সময়কাল থেকে পূর্ণাঙ্গীন বিজয়ের সাল পর্যন্ত যদি হিসাব করা হয় তাহলেও নয় বছর হয়।

বদরের যুদ্ধ ও রোম বিজয়ের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সূরা রউম এ বর্ণিত সুমহান ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে ঈমান–উদ্দীপক বর্ণনা।

মরহুম ফারাস আলি আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব (যুক্তরাজ্য) এর স্মৃতিচারণ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২২ শে সেপ্টেম্বর , ২০২৩, এর জুমুআর খুতবা (২২তবুক ১৪০২ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, কিছুকাল পূর্বে বদরের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে সম্পর্কিত কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম। আজ বদরের প্রেক্ষিতেই কিছু সম্পর্কযুক্ত কথা এবং ঘটনা উপস্থাপন করব। ইতিহাসে এগুলোর উল্লেখ রয়েছে আর এগুলো জানাও আবশ্যক। যেমনটি পূর্বের খুতবাগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) তিন দিন পর্যন্ত বদরের প্রান্তরে অবস্থান করেন।

তৃতীয় দিন তিনি (সা.) বাহনগুলোর হাওদা বাঁধার বা যাত্রার প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেন। বদরের প্রান্তর থেকেই তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা এবং হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে বদরের বিজয়ের সুসংবাদসহ মদীনার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনার উদ্দেশ্যে ফিরতি সফর আরম্ভ করেন। এই বিজয়ী কাফেলার সাথে মক্কার কুরাইশদের ৭০জন বন্দিও ছিল।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪২০,৪২৫,৪২৬) (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৩৯৮৬)

ইতিহাস গ্রন্থসমূহে উল্লেখ রয়েছে যে, পথিমধ্যেই তাদের মধ্য থেকে দুজন বন্দিকে তাদের গুরুতর যুদ্ধাপরাধের কারণে তৎকালীন সাধারণ রীতি অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, যাদের মাঝে একজন ছিল নযর বিন হারেস আর দ্বিতীয়জন ছিল উকবা বিন আবি মুয়ায়েত। কিন্তু এ বিষয়ে ইতিহাসবিদদের সবাই একমত নয়।

আল্লামা ইবনে ইসহাক বলেন, বদর থেকে ফেরার পথে রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন সাফরা নামক স্থানে পৌঁছেন তখন নযর বিন হারেসকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল আর হযরত আলী (রা.) তাকে হত্যা করেছিলেন।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৩৮)

সীরাত হালাবিয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, বন্দি অবস্থায় নযর তার সাথিকে বলে, আল্লাহ্‌র শপথ! মুহাম্মদ(সা.) আমাকে হত্যা করবে, কেননা তিনি আমাকে এমন দৃষ্টিতে দেখেছেন যাতে আমি মৃত্যু দেখতে পেয়েছি। সেই ব্যক্তি নযরকে বলে, আল্লাহ্‌র শপথ, এমনটি কেবল প্রতাপের কারণে হয়েছে। অর্থাৎ, মহানবী (সা.) -এর যে প্রতাপ তোমার ওপর পড়েছে তার কারণে তোমার এমনটি মনে হয়েছে। তখন নযর মুসআব বিন উমায়েরকে বলে যে, হে মুসআব! আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক থেকে এই ব্যক্তির চেয়ে তুমি আমার অধিক নিকটে। অতএব তুমি তোমার সাথির সাথে কথা বলো যেন সে আমাকে বন্দি করে রাখে। আল্লাহ্‌র শপথ! সে আমাকে হত্যা করতে যাচ্ছে। তখন মুসআব বলেন, তুমি আল্লাহ্‌র কিতাব সম্পর্কে অমুক এবং অমুক কথা বলতে আর তুমি মহানবী (সা.) সম্পর্কে অমুক অমুক কথা বলতে। এছাড়া তুমি তাঁর (সা.) সাহাবীদের দুঃখকষ্ট দিতে।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪২০,৪২৯-৪৩০)

অতএব পুরোনো এসব অপরাধের কারণে তোমাকে হয়ত মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতে পারে।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, নযর বিন হারেস-এর বোন কুতায়লা বিন হারেস তার ভাইয়ের মৃত্যুতে কিছু পঙক্তি পাঠ করে। কারো কারো মতে এগুলো তার কন্যা বলেছিল আর পরবর্তীতে সে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিল। মহানবী (সা.) যখন সেই পঙক্তিগুলো সম্পর্কে জানতে পারলেন তখন তিনি অনেক কাঁদেন এমনকি তাঁর শ্মশ্রু ভিজে যায়। এরপর তিনি (সা.) বলেন, যদি এই পঙক্তিগুলো আমার কাছে নযর বিন হারেসের

মৃত্যুদণ্ডের পূর্বে পৌঁছাতো তাহলে আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করে তাকে ক্ষমা করে দিতাম।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৩০)

কিন্তু কতিপয় জীবনীকার এরূপ পঙক্তি এবং এতে মহানবী (সা.)-এর ক্রন্দনের রেওয়ায়েত প্রত্যাখ্যান করেন। কেউ কেউ তো পুরো ঘটনারই অস্বীকার করেন। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন যে, কোনটা সঠিক। এই ঘটনা যদি সত্যিই ঘটে থাকে তাহলে মহানবী (সা.)-এর কোমল হৃদয়ের জন্য এটি অসম্ভব কিছু নয়। তিনি (সা.) অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন, তিনি দয়ার সাগর ছিলেন। অনুরূপভাবে নযর বিন হারেস সম্পর্কে এই রেওয়ায়েতও রয়েছে যে, সে নিহত হয় নি, যেমনটি আমি বলেছি, বরং জীবিত ছিল এবং হুনায়েনের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিল। আর মহানবী (সা.) তার হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে তাকে শত উট প্রদান করেছিলেন।

(শারাহ যারকানি আলাল মোয়হিবুল লাদানিয়াহ, ১ম খণ্ড,পৃ: ৪৮২)

এরপর ইতিহাসে বদরের প্রান্তর থেকে ফিরে আসার পথে দ্বিতীয় যে ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ডের বর্ণনা রয়েছে সে ছিল উকবা বিন আবি মুয়ায়েত। তাকে মদীনায় ফেরার পথে 'ইরকুদ যাবিহা' নামক স্থানে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। হযরত আসেম বিন সাবেত আনসারী উকবাকে হত্যা করেছিলেন। অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আলী (রা.) তাকে হত্যা করেছেন।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৩৮-৪৩)

একজন লেখক লিখেছেন যে, নযর বিন হারেস এবং উকবা বিন আবি মুয়ায়েত উভয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উস্কানিদাতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল আর মুসলমানদের ওপর সীমাহীন অত্যাচার ও নির্যাতনকারীদের হোতা ছিল।

(আল লাওলাউল মাকনুন, সীরাত ইনসাইক্লোপেডিয়া, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৯০-৪৯১)

তাই তারা এই শাস্তি পেয়েছিল।

যাহোক, মৃত্যুদণ্ডের শাস্তিপ্রাপ্ত এই উভয় ব্যক্তি সম্পর্কে সারকথা হলো, উভয়ের সম্পর্কে নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, আসলেই এই উভয় বন্দিকে পথিমধ্যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল কি-না, কেননা কতিপয় এমন রেওয়ায়েত রয়েছে যেগুলোতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, উকবা বিন আবি মুয়ায়েত বদরের প্রান্তরেই নিহত হয়েছিল।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৭৪)

আর নযর বিন হারেস সম্পর্কে উভয় প্রকার রেওয়ায়েত রয়েছে। তার মৃত্যুদণ্ডের রেওয়ায়েতও রয়েছে আর এটিও যে, সে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি পায় নি, বরং পরেও জীবিত ছিল এবং হুনায়েনের যুদ্ধের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিল, যদিও এসব রেওয়ায়েতকে কিছুটা দুর্বল মনে করা হয়।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) 'সীরাত খাতামান নাবিয়্যিন' পুস্তকে বদরের যুদ্ধবন্দিদের মধ্য হতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এই দুজনের উল্লেখ এভাবে করেছেন যে, কতিপয় ইতিহাসবিদ বন্দি নেতাদের মাঝে উকবা বিন আবি মুয়ায়েতের নামও বর্ণনা উল্লেখ করেছেন এবং লিখেছেন যে, তাকে পরবতীতে মহানবী (সা.) -এর আদেশে বন্দি অবস্থায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। কিন্ত একথা সঠিক নয়। হাদীস এবং ইতিহাসে একান্ত স্পষ্টভাবে এই রেওয়ায়েত বিদ্যমান যে, উকবা বিন আবি মুয়ায়েত যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছিল। অর্থাৎ, যুদ্ধ চলাকালীন নিহত হয়েছিল, বন্দি হয় নি। সে মক্কার সেসব নেতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যাদের লাশ একই গর্তে দাফন করা হয়েছিল। যদিও নযর বিন হারেসকে বন্দি অবস্থায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিষয়টি অধিকাংশ রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয়। আর তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কারণ ছিল, মক্কায় কাফিরদের হাতে নিহত নিরপরাধ মুসলমানদের হত্যার জন্য যারা সরাসরি দায়ী ছিল সে সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খুব সম্ভব মহানবী (সা.)-এর সৎপুত্র হারেস বিন আবি হালা, যাকে ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহানবী (সা.)-এর চোখের সামনে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল, তার হত্যাকারীদের মাঝে নযর বিন হারেসও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, নযর ব্যতীত অন্য কোনো বন্দিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় নি আর ইসলামে কেবল শত্রু হওয়ার কারণে বা যুদ্ধে প্রতিপক্ষ হিসেবে অংশ নেওয়ার কারণে বন্দিদের হত্যা করার নিয়মও ছিল না। যেমন এ সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট আদেশও পরবতীতে পবিত্র কুরআনে অবতীর্ণ হয়েছে। এটিও স্মরণ রাখা উচিত যে, যদিও বহু রেওয়ায়েতে নযর বিন হারেসকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার উল্লেখ রয়েছে কিন্তু কিছু এমন রেওয়ায়েতও রয়েছে যেগুলো থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় নি, বরং বদরের যুদ্ধের পর দীর্ঘকাল জীবিত ছিল আর পরিশেষে হুনায়েনের যুদ্ধের সময় মুসলমান হয়ে মহানবী (সা.)-এর সঙ্গীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু প্রথমোক্ত রেওয়ায়েত অর্থাৎ পূর্বের রেওয়ায়েতগুলোর চেয়ে এসব রেওয়ায়েত সাধারণত দুর্বল বলে মনে করা হয়। বাকি আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন।

মোটকথা, বন্দিদের মাঝে কাউকে যদি হত্যা করা হয়ে থাকে তবে সে ছিল নযর বিন হারেস যাকে কিসাস অর্থাৎ হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। আর তার সম্পর্কে এই রেওয়ায়েতও রয়েছে যে, তাকে হত্যার পর যখন মহানবী (সা.) তার বোনের সেই বেদনার্ত পংক্তি শোনেন যাতে তার প্রতি প্রাণ ভিক্ষার আবেদন জানানো হয়েছিল তখন তিনি (সা.) বলেন, যদি এই পংক্তিগুলো আমি আগে পেতাম তাহলে নযরকে ক্ষমা করে দিতাম। যাহোক, নযর ছাড়া আর কোনো যুদ্ধবন্দিকে হত্যা করা হয় নি।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা- মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৩৬৬-৩৬৭)

এটি ইতিহাস গ্রন্থ থেকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের গবেষণার ফলাফল।

বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের বড়ো বড়ো সর্দারসহ সত্তর জন কাফির মুসলমানদের হাতে নিহত হয় এবং সত্তরজন মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়। কতিপয় রেওয়ায়েতে বন্দিদের সংখ্যা কোথাও উনপঞ্চাশ আবার কোথাও চুয়াত্তর বলেও উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সত্তর জন কাফিরের বন্দি হওয়ার রেওয়ায়েতই প্রসিদ্ধ ও সঠিক।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৪৫]

বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে সত্তরই লেখা আছে। সহীহ্ বুখারীর একটি রেওয়ায়েতে উল্লিখিত আছে, মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা বদরের দিন মুশরিকদের একশত চল্লিশ ব্যক্তির ক্ষতিসাধন করে অর্থাৎ সত্তর জন নিহত এবং সত্তর জন বন্দি হয়।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৩৯৮)

মুশরিক বন্দিরা বদরের পর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তাদের বিষয়ে লেখা আছে, সাহাবীরা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী বদরের বন্দিদের সাথে খুবই উত্তম ব্যবহার করেন। সেসকল বন্দির মাঝে কতক সৌভাগ্যবান এমনও ছিলেন যারা ইসলামের শিক্ষা এবং সাহাবীদের উন্নত চারিত্রিক গুণাবলিতে প্রভাবিত হয়ে মুসলমান হয়ে যান। তাদের মাঝে অনেকের নামওউল্লেখ করা হয়েছে যথা: আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব, ওয়াকিল বিন আবি তালেব, নওয়াফেল বিন হারেস, আবুল আস বিন রাবি', আবু আযিয যার নাম যারারাতুবনু উমায়ের আবদারি ছিল, সায়েব বিন আবু হুবায়েশ, খালিদ বিন হিশাম মাখযুমী, আব্দুল্লাহ্ বিন আবু সায়েব, মু ত্তালেব বিন হামতাব, আবু আদা সাহমী, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন খালফ জু মহী, ওয়াহাব বিন উমায়ের জুমহী, সুহায়েল বিন আমর আমরী, আব্দুল্লাহ্ বিন যামআহ ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা বিনতে যামআর ভাই। কায়েস বিন সায়েব এবং মিসতা যে উমাইয়া বিন খালফ-এর ক্রীতদাস ছিল এবংসায়েব বিন উবায়েদ। তারা সকলে বদরের দিন ফিদিয়া আদায় করেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সীরাতিল খায়রিল ইবাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭৮-৭৯)

রোমান সাম্রাজ্যের বিজয়ের সাথে বদরের যুদ্ধেরও একটি সম্পর্ক রয়েছে।

রোমান সাম্রাজ্যের বিজয় সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল আর আমি যেভাবে বলেছি বদরের যুদ্ধের সাথেও এর সম্পর্ক ছিল। তাই এখানে উক্ত বিষয়টি উল্লেখ করা সমীচীন হবে। নবুয়্যতের পঞ্চম বছরে সূরা রূম অবতীর্ণ হয় যেখানে রোমান সাম্রাজ্যের বিজয়ের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

(দালায়েলুন নবুয়্যত লিল বাইহাকি, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৪৩)

এ বিষয়ে বিস্তারিত পরে বলব। আল্লাহ্ তা'লা যখন সূরা রূম-এর প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) মক্কার চারপাশে উক্ত সূরার এই আয়াতসমূহ পড়ে ঘোষণা দিতে থাকেন।

الٓمّٓ ۝ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۝ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۝ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ

রোমানদের পরাজিত করা হয়েছে, নিকটবতী দেশে আর তারা পরাজিত হওয়ার পর তারা পুনরায় বিজয়ী হবে; তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে।

এ ঘটনা মক্কার যুগের যখন উক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। মক্কার মুশরিকরা চাইত যে, পারস্যবাসী যেন রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে, কেননা তারা ও পারস্যবাসীরা মূর্তি পূজারি ছিল। পারস্যের লোক তথা ইরানের লোকেরা মূর্তি পূজারি ছিল, অগ্নি পূজারি ছিল আর মক্কার লোকেরাও মূর্তি পূজারি ছিল। তারা পারস্যের বিজয় দেখতে চাইত আর মুসলমানরা পারসিকদের বিরুদ্ধে রোমানদের বিজয় কামনা করতো কারণ রোমানরা ছিল আহলে কিতাব।

তারা একথা হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলে আর হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-কে উক্ত বিষয়ে অবগত করেন তখন তিনি (সা.) বলেন,

তারা অবশ্যই বিজয় লাভ করবে অর্থাৎ রোমানরা বিজয় লাভ করবে। হযরত আবু বকর (রা.)যখন এটি মুশরিকদের কাছে উল্লেখ করেন তখন তারা বলে যে, আমাদের এবং তোমাদের মাঝে একটি সময় নির্ধারণ করে নাও অর্থাৎ শর্ত নির্ধারণ করো। আমরা যদি বিজয়ী হই তাহলে আমাদের জন্য অমুক অমুক জিনিস নির্ধারিত থাকবে আর যদি তোমরা বিজয়ী হও তাহলে তোমরা অমুক অমুক জিনিস পাবে। তারা পাঁচ বছর ভিন্ন রেওয়ায়েত অনুসারে ছয় বছর মেয়াদ নির্ধারণ করে। শারাহ্ সুনানুত তিরমিযী, তোহফাতুল আহওয়াযীতে লিখিত আছে যে, রোমানদের পারস্যের ওপর বিজয়ের দিনে মু'মিনরা আনন্দিত হয় এবং তারা এর সংবাদ বদরের দিনে তখন জানতে পারেন যখন জিব্রাইল (আ.) সেই বিজয়ের সংবাদ নিয়ে বদরের প্রান্তরে মুশরিকদের বিরুদ্ধে সাহায্যের সুসংবাদ নিয়ে অবতীর্ণ হয়।

(তোহফাতুল আহওয়াযি শারাহ, শারাহ সুনান আত তিরমিযি, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬৯) (সুনান আত তিরমিযি, আবওয়াব তফসীরুল কুরআন, হাদীস-৩১৯৪)

বদরের সাথে এর সম্পর্ক হল, যেদিন বদরের (যুদ্ধে মুসলমানরা) বিজয়ী হয় সেদিন রোমানদের বিজয়েরও সুসংবাদ লাভ হয়।

সহীহ্ বুখারীর একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যার ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আঈনী রোমানদের বিজয় সংক্রান্ত ভবিষদ্বাণীর উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, যখন ইরানী ও রোমানদের মাঝে যুদ্ধ হয় তখন মুসলমানরা পারস্যের বিপরীতে রোমানদের বিজয়ের আকাঙ্ক্ষী ছিল, কেননা রোমানরা আহলে কিতাব ছিল। রোমানরা আহলে কিতাব হওয়ার কারণে তাদের প্রতি মুসলমানদের সহানুভূতি ছিল। এর বিপরীতে কুরাইশের কাফিররা পারস্যের বিজয়ের আকাঙ্ক্ষী ছিল কেননা পার্সিরা ছিল অগ্নিপূজারি; কুরাইশের কাফিররাও ছিল মূর্তিপূজারি। অতএব এ বিষয়ে আবু বকর (রা.) এবং আবু জাহেলের মাঝে শর্ত নির্ধারিত হয় তখন রসূল (সা.) বলেন, সেখানে 'বিজউন' শব্দ রয়েছে আর 'বিজউন' শব্দ নয় বছর বা সাত বছরের জন্য ব্যবহার হয়। সুতরাং সময় বৃদ্ধি করে নাও; ফলে তিনি (রা.) এমনটিই করেন। অতঃপর রোমানরা বিজয়ী হয়।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

الٓمّٓ ۔ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۔ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۔ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۭ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ۭ وَيَوْمَىِٕذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۔ بِنَصْرِ اللّٰهِ (الروم:2 تا 6)

অর্থাৎ আলিম লাম মীম। [আনাল্লাহু আ'লামু] অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখি। রোমানদের পরাস্থ করা হয়েছে নিকটবর্তী দেশে এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর অচিরেই বিজয়ী হবে। তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে। সকল অধিপত্য পূর্বে এবং পরে আল্লাহ্রই। সেদিন মু'মিনরা আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যে লব্ধ নিজেদের বিজয়ে অনেক আনন্দিত হবে। (সূরা রউম: ২-৬)

শা'বী বলেন, সেসময় বাজি ধরা বৈধ ছিল।

(উমদাতুল ক্বারী, শারাহ বুখারী, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৯)

মহানবী (সা.) যে-সকল ঘটনা সম্পর্কে ভবিষদ্বাণী করেছিলেন সেসবের মধ্যে একটি অতি স্পষ্ট এবং অসাধারণ ভবিষদ্বাণী ছিল রোম বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী।

আরবের উভয় পাশে রোমান এবং পারস্যের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। তৎকালীন পারস্যের বাদশা ছিল খসরু পারভেজ এবং রোমানের শাসক ছিল হিরাকেল। এই দুই সাম্রাজ্যের মাঝে এক সুদীর্ঘকাল থেকে উপর্যুপরি যুদ্ধ লেগে ছিল। নবুয়্যতের পঞ্চম বছর ৬১৪ খ্রিষ্টাব্দে এই দুই প্রতিবেশী সাম্রাজ্যের মাঝে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যদিও এই দুই জাতির মধ্য থেকে কোনো জাতিই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নি। তবুও যেহেতু রোমান জাতি ছিল হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারী এবং আহলে কিতাব আর ইরানীদের বিশ্বাসের সাথে মক্কার মুশরিকদের বিশ্বাস সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল তাই স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের রোমান খ্রিষ্টানদের প্রতি এবং মক্কার মুশরিকদের ইরানীদের প্রতি সহানুভূতি ছিল। এ কারণে মুসলমান এবং কুরাইশ কাফির উভয়ই যুদ্ধের ফলাফলের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ছিল। এই উভয় সাম্রাজ্যের সীমান্ত দাজলা এবং ফুরাতের তীরে এসে মিলিত হতো। রোমান সাম্রাজ্য পূর্বদিকে এশিয়া মাইনর তথা ইরাক-সীমান্ত, সিরিয়া, ফিলিস্তিন এবং মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইরানীরা দুই দিক থেকে আক্রমণ রচনা করে। একদিকে দাজলা এবং ফুরাত (নদীর) তীর ধরে সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হয় আর অপরদিকে এশিয়া মাইনরের আজরবাইযান থেকে আরমেনিয়া হয়ে বর্তমান আনাতোলিয়া প্রবেশ করে। উভয় দিক থেকে রোমানদেরকে পিছু হটিয়ে সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে যায়। সিরিয়ার দিকে তারা একের পর এক এই পবিত্র ভূমির একেকটি শহর রোমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। ৬১৪ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিস্তিন এবং এর পবিত্র শহর জেরুযালেম ইরানীদের করতলগত হয়। গির্জাসমূহ ধূলিসাৎ করা হয়। ধর্মীয় পবিত্র চিহ্নাবলির অবমাননা করা হয়। ইরানের রাজপ্রাসাদ ত্রিশ হাজার নিহত ব্যক্তির মস্তক দিয়ে সজ্জিত করা হয় অর্থাৎ হত্যা করে তার প্রাসাদে মাথা রাখা হয়। ইরানী বিজয়ের করাল থাবা আরো বিস্তৃত হয়ে ৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্পূর্ণ নীল উপত্যকা তথা মিশর রাজ্য দখল করে নেয় এবং পরিশেষে আলেকজান্দ্রিয়ার উপকূলে গিয়ে থামে। অপরদিকে সমস্ত এশিয়া মাইনরকে তছনছ করে বসফরাস তীরে গিয়ে স্থির হয় এবং কনস্টান্টিনোপলের দেওয়ালে গিয়ে ঠেকে। রোমান সাম্রাটের রাজধানীর সামনে ইরানের বিজয় সেনারা তাঁবু গাড়ে আর বর্তমানে রোমানদের পরিবর্তে ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিশর এবং এশিয়া মাইনরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইরানী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সর্বত্র অগ্নিকুণ্ড নির্মিত হয় এবং মসীহ্র স্থলে আগুন এবং সূর্যের জবরদস্তিমূলক পূজার প্রচলন করা হয়। রোমান সাম্রাজ্যের এমন ধ্বংস দেখে রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিদ্রোহ মাথা চাড়া দেয়। আফ্রিকাতেও বিদ্রোহ হয়। স্বয়ং কনস্টান্টিনোপলের নিকটে ইউরোপে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠি রক্তপাতে মেতে ওঠে। সর্বোপরি সেসময় রোম সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছিল।

যুদ্ধের যখন এরূপ অপ্রত্যাশিত ফলাফল প্রকাশ পায় তখন মুসলমানরা ভীষণ কষ্ট পেল এবং কাফিরদের খুশির কারণ হলো। তারা মুসলমানদের এই বলে বিদ্রুপ করল যে, যেভাবে আমাদের ভাইয়েরা বিজয় লাভ করেছে ঠিক সেভাবে তোমরা যদি আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে তবে আমরাও বিজয় লাভ করতাম। কাফিররা বলল, আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করব- এটি একথা থেকে প্রকাশ পায়। সেসময় রোমানদের যে শোচনীয় পরিস্থিতি ছিল তা আমরা দেখেছি। তারা তাদের প্রাচ্যের অধিকৃত অঞ্চলের প্রতিটি ইঞ্চি হারিয়ে বসেছিল। রাজকোষ খালি ছিল, সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল, দেশে বিদ্রোহ বিরাজমান ছিল। রোমের বাদশা হিরাক্লিয়াস সর্বক্ষণ বিলাসিতা,অবহেলা ও অলীক সব ধ্যানধারণায় মত্ত ছিল। এক অথর্ব বাদশা ছিল যে-কিনা কোনো যোগ্যতাই রাখত না। ইরানের বিজয় সেনারা কনস্টান্টিনোপলের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে রোমানদের সামনে নিম্নোক্ত শর্তাবা ল উপস্থাপন করে যে, রোমানদের ট্যাক্স দিতে হবে। এক হাজার ট্যালেন্ট স্বর্ণ, এক হাজার ট্যালেন্ট রৌপ্য [ট্যালেন্ট হলো প্রাচীন ইউনানী পরিমাপ যা বর্তমানে প্রায় ২৩ কিলোগ্রাম ওজনের সমান], এক হাজার রেশমী কাপড়ের থান, এক হাজার ঘোড়া এবং এক হাজার কুমারী মেয়ে ইরানীদের হাতে তুলে দিবে।

রোমানদের অবস্থা এতটা দুর্বল ছিল যে, তারা এসব লজ্জাস্কর শর্তাবলী মেনে নেয়। এ বাস্তবতা সত্ত্বেও রোমান দূত ইরানের রাজদরবারে সন্ধির বার্তা নিয়ে গেলে অহংকারী খসরু যে উত্তর দিয়েছিল তা হলো, তোমরা যা নিয়ে এসেছ আমি তা কবুল করে নিব এমন নয় বরং হিরাক্লিয়াসকে শিকলাবদ্ধ অবস্থায় আমার সিংহাসনের সামনে নতজানু অবস্থায় দেখতে চাই। রোমের বাদশাকে আমি আমার সিংহাসনের নীচে চাই আর ততক্ষণ সন্ধি করব না যতক্ষণ রোমের বাদশা নিজের ক্রুশবিদ্ধ খোদাকে পরিত্যাগ করে সূর্য দেবতার সামনে না মাথা নত করবে অর্থাৎ খ্রিষ্টান ধর্ম ছেড়ে তওবা না করবে। যাহোক, কোনো লেখক লিখেন, রণাঙ্গনের অবস্থা এমন ছিল যে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে একটি শুষ্ক ও অনুর্বর দেশের নির্জন পর্বত থেকে একজন শান্তির যুবরাজ আবির্ভূত হন এবং পৃথিবীতে বিরাজমান বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিপরীতে কুরআন শরীফে বিদ্যমান এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন যার আয়াতসমূহ আমি একটু পরে পড়ব। অতএব আমি এর বিস্তারিত বিবরণ একারণে দিয়েছি যেন ভবিষ্যদ্বাণীর মহিমা উপলব্ধি হয়। এই ভবিষ্যদ্বাণী কী ছিল- যেভাবে আমি পূর্বেও পড়েছি আবারও পড়ে দিচ্ছি।

الٓمّٓ ۔ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۔ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۔ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۭ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ۭ وَيَوْمَىِٕذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۔ بِنَصْرِ اللّٰهِ ۭ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۔ وَعْدَ اللّٰهِ ۭ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ

অর্থ: আমি আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি জানি। রোমানদের পরাজিত করা হয়েছে, নিকটবর্তী দেশে। আর তাদের পরাজয়ের পর তারা অবশ্যই (আবার) বিজয়ী হবে; তিন থেকে নয় বছরের মাঝে। (এ ঘটনার) পূর্বেও এবং পরেও আল্লাহ্রই আদেশ (কার্যকর) হয়ে থাকে। আর সেদিন মু 'মিনরা

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

(নিজেদের বিজয়েও) খুব আনন্দিত হবে, (যা) আল্লাহ্‌র সাহায্যে (হবে)। তিনি যাকে চান সাহায্য করেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী (ও) বার বার কৃপাকারী। (এটি) আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি (এবং) আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না। (সূরা আর রূম: ২-৭)

এ ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে লেখকরা লিখেছেন যে, বাস্তবতার নিরিখে এতটা অকল্পনীয় ও অবিশ্বাস্য ছিল অর্থাৎ এতটা সুদূর পরাহত মনে হতো যে, কাফিররা তা সঠিক প্রমাণিত হলে মুসলমানদের সাথে অনেকগুলো উট প্রদানের শর্ত দিয়েছিল। এখন মুসলমান ও কাফিররা এ ঘটনা কীভাবে ঘটে তা দেখার অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ছিল। পরিশেষে কয়েক বছর পর অপ্রত্যাশিতভাবে দৃশ্যপট পাল্টে যায়। 'রোমান সাম্রাজ্যের পতন'-এর লেখক প্রসিদ্ধ ঐতিহসিক এডওয়ার্ড গিবন হিরাক্লিয়াসের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন, শাহেনশাহ, যাকে রাজত্বের প্রথম ও শেষ বছরগুলোতে আলস্য আমোদ-প্রমোদ ও কু সংস্কারের দাস আর অলীক ধ্যানধারণায় লিপ্ত এবং প্রজাদের সমস্যাবলীর নপুংসক-নির্বিকার দর্শক বলে নয়, যেভাবে সকাল-সন্ধ্যার কুয়াশা মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের কিরণের মাধ্যমে অপসৃত হয় তদ্রুপ ৬২১ খ্রিষ্টাব্দে রাজপ্রাসাদের আর্কাডিউস একনিমিষে যুদ্ধক্ষেত্রের সিজার হয়ে যায়। অর্থাৎ এই রোমের বাদশার কথা বলা হচ্ছে। আর রোম ও হিরাক্লিয়াসের সম্মান ছয়টি গৌরবজনক যুদ্ধাভিযানের মাধ্যমে অত্যন্ত পুনরুদ্ধার করা হয়"।

তিনি আর্কাডিউসের যে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন, সে রোমান সাম্রাজ্যের একজন বাদশা ছিল, যার রাজত্বকাল ৪০৮-৩৭৮ খ্রিষ্টপূর্ব ছিল। অত্যন্ত শক্তিশালী বাদশাহ ছিল। অনুরূপভাবে সিজারও একজন অভিজ্ঞ সেনাপতি ছিল।

যাহোক, হিরাক্লিয়াস যখন তার অবশিষ্ট সৈন্যদল নিয়ে কনস্টান্টিনোপল থেকে রওয়ানা হয় তখন মানুষ জানত যে, বিশ্ব মহান রোমান সাম্রাজ্যের শেষ সৈন্যবাহিনীর প্রত্যক্ষ করছে। কিন্তু আরবের নিরক্ষর নবীর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে এবং যখনকিনা মুসলমানরা বদরের প্রান্তরে কাফিরদের পরাজিত করেছে ঠিক সেই সময়ই রোমানরা পারস্যবাসীদের ওপর বিজয় লাভ করেছে। রাজত্বের পূর্বাঞ্চলের হারানো প্রত্যেকটি শহর পুনরায় হস্তগত করেছে আর পারস্যবাসীদের বসফরাস ও নীলনদের কিনারা থেকে হটিয়ে পুনরায় দাজলা ও ফুরাতের উপকূলের দিকে ঠেলে দেয়।

এই মহান ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা পৃথিবীকে স্তম্ভিত করে দেয়। কুরাইশদের অনেক লোক এই সত্যতার প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে মুসলমান হয়ে যায় আর ঘটনার সাড়ে বারোশো বছর পর এডওয়ার্ড গিবন এই আশ্চর্যপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতায় হতবাক হয়ে বলেন, একজন অমুসলিম এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্যতা স্বীকার করছেন। তিনি বলেন, মুহাম্মদ (সা.) প্রাচ্যের দুই বিশাল সাম্রাজ্যের সীমান্তে বসে তাদের পরস্পরকে ধ্বংসকারী ক্রমবর্ধমান প্রচেষ্টার অগ্রগতি সানন্দে গভীর মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। একন্ত সে সময়ে যখন কিনা পারস্যবাসী দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করছিল, তিনি (সা.) এ ভবিষ্যদ্বাণী করার সাহস দেখান যে, কয়েক বছরের মধ্যে রোমান সাম্রাজ্য সাফল্য ও বিজয় লাভ করবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী যখন করা হয়েছিল তখন এর চেয়ে বেশি অবাস্তব ও অসম্ভব কোনো ভবিষ্যদ্বাণীর কথা কল্পনাই করা যেতো না। এটি কেউ বিশ্বাসই করতে পারত না, কেননা হিরাক্লিয়াসের বারো বছরের রাজত্ব এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিল যে, অচিরেই রোমান সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য ।"

হিরাক্লিয়াসের প্রকৃতিতে এ আশ্চর্যজনক ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বিষয়ে রোমান ইতিহাসের লেখকরা অদ্ভুত সব বিষয়াদি লিখেছে। (গিবন লিখছেন) কিন্তু তারা জানত না যে, সে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধক্ষেত্রের অদূরে একজন নবীর হাত রোমানদের সাহায্যের জন্য প্রসারিত ছিল আর সেটিই এই বিপ্লব ও পরিবর্তনের আধ্যাত্মিক কারণ ছিল। মুসতাদরেক ও জামে তিরমিযী থেকে উদ্ধৃ ত করে তিনি বলেন, রোম ওপারস্যের যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন মুশরিকরা ইরানীদের পক্ষে ছিল, কেননা তারাও মূর্তি পূজারি ছিল আর মুসলমানরা রোমানদের পক্ষে ছিল, কেননা তারা আহলে কিতাব ছিল। সে সময় পারস্যবাসীরা রোমানদেরকে ক্রমাগত পরাস্ত করছিল। তখনই সূরা রূমের ভবিষ্যদ্বাণী অবতীর্ণ হয়। হযরত আবু বকর চিৎকার করে উচ্চৈস্বরে সকল মুশরিককে এই ভবিষ্যদ্বাণী শোনান। মুশরিকরা বলে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য কোনো সময়সীমা নির্ধারণ করো। হযরত আবু বকর পাঁচ বছরের শর্ত নির্ধারণ করেন। মহানবী (সা.) যখন এটি জানতে পারলেন তখন বললেন, 'বিযউন' শব্দ তিন থেকে নয়ের জন্য বলা হয়। তাই দশ বছরের কিছু কম সময় নির্ধারণ করা উচিত ছিল। সুতরাং এই ব্যাখ্যানুযায়ী (ভবিষ্যদ্বাণীর) নবম বছর বদরের যুদ্ধের প্রাক্কালে এই ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ হয় এবং রোমানরা জয় লাভ করে।

অনেক তরুণ ও যৌবনে পদার্পণকারী কিশোররা জিজ্ঞেস করেছে, বেশ কিছু পত্র লিখে; গত সপ্তাহেও কিছু পত্র এসেছে যে, আমরা কীভাবে বুঝব, ইসলাম সত্য ধর্ম এবং মহানবী (সা.)-ই সত্য নবী, অন্যরা নয়। এখানকার পরিবেশ তাদের উপর এরূপ বিরূপ প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে যে, তাঁরা ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে সন্দিহান হচ্ছে। তাদের এই ইতিহাস ও অমুসলিমদের অভিব্যক্তি পড়ে বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। এছাড়া বর্তমান যুগ সম্পর্কে কুরআন করীমে যে-সব ভবিষ্যদ্বাণী আছে তা দেখা উচিত। পিতামাতারা কুরআন করীম পাঠ করুন এবং এরপর নিজেদের সন্তানদেরও ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ দেখান যে, এগুলো ইসলামের সত্যতার কত অসাধারণ প্রমাণ। ইসলামের সত্যতার প্রমাণ তো অসংখ্য। সুতরাং আমাদের অর্থাৎ পিতামাতা এবং তরুণদেরও জ্ঞান বৃদ্ধি করা জরুরি।

শুধুমাত্র প্রশ্ন করাই যথেষ্ট নয়,যদি প্রশ্ন করেন তাহলে নিজেরা জ্ঞানার্জনেরও চেষ্টা করুন। অনুরূপভাবে আমাদের জামা'তী অঙ্গসংগঠনগুলোর এ প্রেক্ষাপটে সদস্যদের শিখানো উচিত। আমাকে বেশ কয়েকবার এরূপ প্রশ্ন করা হয়েছে। যাহোক, এটি স্পষ্ট করা জরুরি ছিল, তাই আমি এর উল্লেখ করেছি। এখন মূল বিষয়ের দিকে ফিরে আসছি।

বদরের যুদ্ধ হিজরতের প্রথম বছর এবং নবুয়্যতের চৌদ্দতম বছরে সংঘটিত হয়েছিল। এর নয় বছর পূর্বে ছিল নবুয়্যতের পঞ্চম বছর। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ভবিষ্যদ্বাণীর সময়টি নবুয়্যতের পঞ্চম বছর ছিল এবং এটি পূর্ণ হয়েছিল মহানবীর দাবির চৌদ্দতম বছরে বা এক হিজরী সনে। অনেকে এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার যুগ হিসেবে হুদায়বিয়ার সন্ধির সাল অর্থাৎ ছয় হিজরী সন উল্লেখ করেছে। (কিন্তু) এটি ঠিক নয়। সম্ভবত লোকেরা ভুল করেছেন এ কারণে যে সহীহ্ বুখারী প্রভৃতিতে উল্লেখ আছে, মুহাম্মদ (সা.)-এর দূত যখন ইসলামের তবলীগি পত্র নিয়ে রোমান সম্রাটের কাছে গিয়েছিলেন তখন সেই সম্রাট বিজয়ের কৃতজ্ঞতা জানাতে সিরিয়া এসেছিল।বাস্তব কথা হলো, দূত হুদায়বিয়ার সন্ধির বছরে যাত্রা করেছিল। তাই মানুষ ধরে নিয়েছে যে, সেটিই বিজয়ের বছর ছিল, কিন্তু এ ধারণা ভুল। অথচ এটি একেবারে স্পষ্ট যে, সেটি বিজয়ের বছর ছিল না, বরং বিজয়োৎসব পালনের বছর ছিল।

সে সময় সেই বাদশা বিজয়োৎসব পালনের জন্য এসেছিল। যাহোক ইতিহাস থেকে এটি প্রমাণিত যে, ৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে মহানবী (সা.) নবুয়্যত লাভ করেন। ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে রোম এবং পারস্যের মাঝে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ৬১৩ খ্রিষ্টাব্দে যুদ্ধের ঘোষণা করা হয়। ৬১৪ খ্রিষ্টাব্দে রোমানদের পরাজয়ের সূচনা ঘটে। ৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে তারা সম্পূর্ণভাবে পরাজয় বরণ করে। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে রোমানরা পুনরায় আক্রমণ শুরু করে। ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে তাদের সফলতা শুরু হয় এবং ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে তারা পূর্ণ বিজয় লাভ করে। এ ধারাবাহিকতায় দেখলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর বিশেষত্ব হল, যদি পরাজয়ের সূচনার বছর থেকে বিজয়ের সূচনার বছর পর্যন্ত হিসাব করা হয় তাহলে নয় বছর হয়। আবার পূর্ণ পরাজয়ের সময়কাল থেকে পূর্ণাঙ্গীন বিজয়ের সাল পর্যন্ত যদি হিসাব করা হয় তাহলেও নয় বছর হয়।

এই পূর্ণাঙ্গীন বিজয় লাভের পর হিরাক্লিয়াস পূর্ববৎ অলস ও বিলাসী বাদশা হয়ে যায়। এরূপ মনে হতো যে, ঐশী হাত কেবল এই ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে কয়েক বছরের জন্য তার মনমস্তিষ্ককে সজাগ করেন এবং তার সাঙ্গপাঙ্গকে জাগ্রত করেন। ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ হওয়ার পর পুনরায় পূর্বের ন্যায় বিলাসিতা ও আলস্য তাকে আরামআয়েশ ও উদাসীনতার ঘোরে আচ্ছন্ন করে।

(সীরাতন নবী, প্রণেতা-শিবলী নুমানি,২য় খণ্ড,পৃ: ৩১৩-৩১৬)

আল্লামা শিবলী নোমানী তাঁর ইতিহাসগ্রন্থেও এসব লিখেছেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) রোমানদের বিজয় সম্পর্কে ঐতিহাসিক মতবিরোধের সমাধান এভাবে করেছেন যে, কিছু রেওয়ায়েতে

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

যুগ ইমামের বাণী

যাঁর আশিস ও কল্যাণের ধারা সদা প্রবাহমান, তিনিই হলেন জীবিত নবী। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)

উল্লেখ করা হয়েছে, রোমানদের বিজয় হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় অর্জিত হয়েছিল। কিন্তু এ দুটি রেওয়ায়েত পরস্পর-বিরোধী নয়, কেননা প্রকৃতপক্ষে রোমানদের বিজয়কাল বদরের যুদ্ধ থেকে হুদায়বিয়া সন্ধির সময় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ”

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৩৭৭)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, মহানবী (সা.)-এর মক্কায় থাকা অবস্থায় আরবে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, পারস্যবাসী রোমানদের পরাজিত করেছে। এটি শুনে মক্কাবাসীরা খুবই আনন্দিত হয় যে, আমরাও মুশরিক আর পারস্যবাসীও মুশরিক। পারস্যবাসীদের রোমানদের পরাজয় একটি শুভ লক্ষণ যার অর্থ হলো, মক্কাবাসীরাও মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওপর বিজয়ী হবে কিন্তু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে খোদা তা'লা বলেন, غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۔ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۔ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ সিরিয়া অঞ্চলে রোমানরা পরাজিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু এ পরাজয়কে তোমরা চূড়ান্ত মনে করবে না। পরাজয়ের পর নয় বছরের মধ্যে রোমানরা আবার বিজয়ী হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশিত হলে মক্কাবাসীরা খিলখিলিয়ে হাসে। এমনকি হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাথে কয়েকজন কাফির শত শত উট বাজি ধরে যে, যদি এই পরাজয়ের পরও রোমানরা পুনরায় প্রাধান্য লাভ করে তবে আমরা তোমাকে একশত উট দিব। আর যদি এরূপ না হয় তবে তুমি আমাদেরকে একশত উট দিবে। বাহ্যত এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছিল। সিরিয়ায় পরাজয়ের পররোমান সৈন্যবাহিনী ক্রমাগতভাবে পরাজিত হয়ে পিঁছু হটতে থাকে। এমনকি পারস্য সেনাবাহিনী মারমারা সমুদ্রের তীর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কনস্টান্টিনোপল তাদের এশিয়াটিক শাসন থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং শক্তিশালী রোমান সাম্রাজ্য একটি মাত্র রাজ্যে পরিণত হয়, কিন্তু খোদার বাণী পূর্ণ হওয়ার ছিল আর তা হয়েও যায়।

চরম হতাশাজনক অবস্থায় রোম সম্রাট তার সৈন্যদের নিয়ে শেষ আক্রমণের উদ্দেশ্যে কনস্টান্টিনোপল ছেড়ে এশিয়ার উপকূলে এসে পারস্যবাসীর সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধে লিপ্ত হয়। রোমান সৈন্যবাহিনী সংখ্যা ও সাজসরঞ্জামে কম থাকা সত্ত্বেও পবিত্র কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে পারস্যবাসীদের ওপর বিজয়ী হয়। পারস্য সেনারা এমনভাবে পালিয়ে যায় যে, ইরানের সীমান্তে র বাইরে কোথাও তারা দাঁড়াতে পারে নি। এভাবে পুনরায় আফ্রিকান এবং এশিয়ান বিজিত দেশগুলো রোমান সাম্রাজ্যের দখলে চলে আসে।”

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৪৪৫)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যখন আবু জাহলের সাথে বাজি ধরেছিলেন এবং পবিত্র কুরআনের এ ভবিষ্যদ্বাণীকে

الٓمّٓ ۔ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۔ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۔ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ

(আর রউম: ২-৫)

শর্তের ভিত্তি নির্ধারণ করেন এবং তিন বছর সময় নির্ধারণ করেন। মহানবী (সা.) অবিলম্বে তঁ ার দূরদর্শিতাকে কাজে লাগিয়ে আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে শর্ত কিছুটা পরিবর্তনের নির্দেশ দেন এবং বলেন, বিযয়ে সিনীন শব্দটি ব্যাখ্যামূলক এবং প্রায়শই নয় বছর পর্যন্ত প্রযোজ্য হয়। ”

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১০-৩১১)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, রোমের বাদশা খ্রিষ্টান হলেও এক ইশ্বরে বিশ্বাসী ছিল এবং হযরত ঈসা (আ.)-কে খোদাপুত্র বিশ্বাস করত না। তাই তার সামনে যখন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত মসীহ্র কথা উল্লেখ করা হয় তখন তিনি বলেন, আমার দৃষ্টিতে মসীহ্র মর্যাদা এর চেয়ে এক বিন্দুও বেশি নয় যা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। বুখারী শরীফের হাদীসে এর সাক্ষ্য বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এটি সেই বাণী যা তওরাতে রয়েছে আর তার মর্যাদা নবীর চেয়ে বড়ো নয়। এ প্রেক্ষিতেই الٓمّٓ ۔ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۔ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۔ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ (আর রউম: ২-৫)- আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ রোমানরা এখন পরাজিত হয়েছে কিন্তু অল্প সময়, অর্থাৎ নয় বছরের মধ্যে আবার বিজয়ী হবে।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

“ তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।”

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

খ্রিষ্টানরা নিছক দুষ্টামির ছলে বলে, মহানবী (সা.) উভয় শক্তির সম্পর্কে একটি অনুমান করে তারপর বিচক্ষণতার সাথে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। (এর প্রত্যুত্তরে) আমরা বলি, অনুরূপভাবে (তোমাদের) মসীহ্ও অসুস্থদের দেখে অনুমান করে নিতেন আর যাদের দেখে সুস্থ হওয়ার যোগ্য মনে হতো তাদের তিনি সুস্থ করে দিতেন। [এখানে তিনি (আ.) তুলনামূলক আলোচনা করছেন আর আসলে তিনি (আ.) এখানে তাদের আপত্তির উত্তর দিয়েছেন।] এভাবে তো সকল নিদর্শনই তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। يَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ এই দিন মু'মিনদের দুটি খুশি হবে। একটি হলো বদরের বিজয় এবং অন্যটি রোম সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার বিজয়। ”

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯৮-২৯৯)

তাদের যদি এ আপত্তি থেকে থাকে যে, [মহানবী (সা.) ইরান ও রোমের] যুদ্ধ দেখেছিলেন কিন্তু বদরের যুদ্ধের পরিস্থিতি তো এরূপ ছিল না আর এর বিজয়ের সংবাদও এর সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এদুটি সুসংবাদ এক সাথে পেয়েছেন।

তিনি (আ.) আরো বলেন, পবিত্র কুরআন অনেক অনেক ভবিষ্যদ্বাণীতে পরিপূর্ণ। যেমন- রোম এবং ইরানের সাম্রাজ্যদ্বয় সম্পর্কিত শক্তিশালী ভবিষ্যদ্বাণী পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান। এটি সেই সময়কার ভবিষ্যদ্বাণী যখন একটি যুদ্ধে অগ্নি পূজারি সাম্রাজ্য রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেছিল এবং তাদের কিছু জমি তারা দখল করে নিয়েছিল তখন মক্কার মুশরিকরা পারস্যের বিজয়কে তাদের জন্য একটি শুভ ইঙ্গিত মনে করে নিয়েছিল। এছাড়া এ থেকে তারা মনে করে নিয়েছিল, যেহেতু পারস্য সাম্রাজ্য সৃষ্টিপূজার ক্ষেত্রে আমাদের সাথে আছে তাই আমরাও আমাদের এই নবীকে নির্মূল করব যার শরিয়ত আহলে কিতাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তখন আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে এই ভবিষ্যদ্বাণী অবতীর্ণ করেন যে, পরিশেষে রোমান সাম্রাজ্যের বিজয় হবে আর যেহেতু এই ভবিষ্যদ্বাণীটি রোমের বিজয় সম্পর্কিত তাই এ সূরার নাম সূরা রূম রাখা হয়েছে। যেহেতু আরবের মুশরিকরা অগ্নি পূজারিদের রাজ্যের বিজয়কে নিজেদের বিজয়ের নিদর্শন মনে করে নিয়েছিল তাই খোদা তা'লা এই ভবিষ্যদ্বাণীতে আরো বলে দিয়েছেন যে, রোমানরা যেদিন বিজয় লাভ করবে সেদিন মুসলমানরাও মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে। অতএব এমনটিই ঘটে।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আয়াতটি এখানে দেওয়া হলো- الٓمّٓ ۔ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۔ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۔ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ (আর রউম: ২-৫) আমিই আল্লাহ্ যিনি সবচেয়ে বেশি জানেন। রোমান সাম্রাজ্য নিকটবর্তী দেশে পরাজিত হয়েছে এবং সেসব লোক আবার ৩ বছর পর হতে ৯ বছরের ভিতর অগ্নিপূজারি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে এবং সেদিন মু'মিনদের জন্যও একটি আনন্দের দিন হবে। অতএব এমনটিই ঘটে আর ৩ বছর পর ৯ বছরের মধ্যে আবারো রোমান সাম্রাজ্য পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে এবং একই দিনে মুসলিমরাও মুশরিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে, কেননা সেদিন ছিল বদর যুদ্ধের দিন যেখানে মুসলমানরা বিজয়ী হয়েছিল। ”

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩২০)

পুনরায় তিনি বলেন, এখন ভেবে দেখুন! এটি কেমন বিস্ময়কর ও মহিমান্বিত ভবিষ্যদ্বাণী। এমন এক সময়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যখন মুসলমানদের শক্তিহীনতা ও দুর্বল ভয়াবহ ছিল। কোনো সাজসরঞ্জাম ছিল না আর কোনো শক্তিও ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে বিরোধীরা বলত, এ দলটি খুব শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাবে। এতে সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছে। এরপর يَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ বলার মাধ্যমে দুটি ভবিষ্যদ্বাণী বানিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ যেদিন রোমানরা পারস্যের বিরুদ্ধে জয় লাভ করবে সেদিন মুসলমানরাও সফলকাম হয়ে আনন্দিত হবে। অতএব যেভাবে এ ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিল বদরের দিন তা সেভাবেই পূর্ণ হয়ে যায়। একদিকে রোমানরা জয়লাভ করে আর অপরদিকে মুসলমানরা বিজয়ী হয়।”

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৮৭)

যাহোক, মহানবী (সা.)-এর সাথে সম্পৃক্ত ঘটনাবলির এই ধারাবাহিক বর্ণনা অব্যহত থাকবে। বাকিটা পরে বলব, ইনশাআল্লাহ্ ।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযাও পড়াবো যা যুক্তরাজ্য নিবাসী জনাব ফারাজ আলী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের (জানাযা)। সম্প্রতি তিনি ৪৭ বছর বয়সে মারা যান। ***‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন’***। তিনি ইরাকি বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং ২০১২ সালে বয়আত করে জামা'তভুক্ত হয়েছিলেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ও এক কন্যা রয়েছেন। শৈশবেই তিনি পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেছিলেন। বড়ো

খুতবার শেষাংশ শেষের পাতায়.....

জুমআর খুতবা

রসূল অবমাননার এমন কোনো শাস্তির উল্লেখ ইসলামী শরিয়তে নেই আর এমন ঘটনার কোনো সত্যতাও নেই।

মুশরিকরাও নিজেদের শিরককে ধর্ম মনে করত আর এক খোদার ইবাদতকে পথভ্রষ্টতা জ্ঞান করত। আজকালও একই অবস্থা বিরাজমান।

উমায়ের বিন ওয়াহাব এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা।

উমায়ের বললেন, 'মনে হয় যেন খোদা সহায় আছেন যিনি আপনাকে আমাদের অভিপ্রায়ের বিষয়ে অবগত করে দিয়েছেন। অন্যথায় যখন সাফওয়ানের সাথে আমার কথা হয়েছিল তখন সেখানে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি উপস্থিত ছিল না। আর খুব সম্ভব খোদা তা'লা আমার ঈমান আনার সুবিধার্থে এমনটি করিয়েছে। আমি সত্যনিষ্ঠ হৃদয়ে আপনার প্রতি ঈমান আনছি।'

বদরের ঘটনার পর অনেকে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে কপটতা ছিল। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সালুল ছিল তাদেরই একজন।

মহানবী (সা.) কারাকারাতুল কুদর এ ছিলেন তাঁর মোকাবিলা করার কারো বুকের পাটা হয় নি। এভাবে মহানবী (সা.) বিনাযুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ফেরত আসেন।

হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে রমযান মাসের পরিসমাপ্তিতে তিনি (সা.) প্রথমবার ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন করেন।

ইসলামের ঈদগুলো নিজেদের মাঝে এক অদ্ভুত মহিমা রাখে। এর মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ওপর আলোকপাত হয় আর প্রণিধানের সুযোগ লাভ হয় যে, ইসলাম কীভাবে মুসলমানদের সকল কাজকে আল্লাহ তা'লার যিকরের সাথে সম্পৃক্ত করতে চায়।"

আসমা বিনতে মারওয়ান এর হত্যা সংক্রান্ত হাদীসের বিশ্লেষাত্মক আলোচনা এবং রসুল অবমাননার শাস্তি সম্পর্কিত একটি সংশয়পূর্ণ হাদীসের বিষয়ে আলোচনা।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ২৯ই সেপ্টেম্বর , ২০২৩, **এর জুমুআর খুতবা (২৯ তবুক ১৪০২ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, বদরের যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনাবলীর বর্ণনা চলছিল। এসব ঘটনা থেকে আমরা যেখানে মহানবী (সা.)-এর জীবনী ও জীবনের ঘটনাবলি জানতে পারি, সেখানে কিছু ঐতিহাসিক বিষয়ও জানা যায়। এছাড়া ইতিহাস পাঠ করলে কিছু ভুল রেওয়ায়েতও চিহ্নিত হয় যেগুলো অন্যদের সামনে ইসলামের ভ্রান্ত চেহারা তুলে ধরেছে। ইসলাম বিরোধীরা এর দ্বারা ইসলামকে দুর্নাম করার সুযোগ গ্রহণ করে আর উগ্রপন্থী মুসলমানরা এর মাধ্যমে নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টা করে।

যাহোক, আজ আমি যে-সব ঘটনা বর্ণনা করতে যাচ্ছি সেগুলোর মাঝে প্রথম ঘটনাটি হলো উমায়ের বিন ওয়াহাব-এর যিনি যুদ্ধের পর নিজেদের ব্যর্থতা, অর্থাৎ মুশরিকদের ব্যর্থতার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মহানবী (সা.)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে মদীনায় এসেছিল। কিন্তু সেখানে ঐশী নিয়তি ভিন্ন কাজ করে আর তাকে ইসলাম গ্রহণের তৌফিক দান করে। এর বিস্তারিত বর্ণনায় লেখা আছে যে, বদরের যুদ্ধবন্দিদের মাঝে ওয়াহাব বিন উমায়েরও ছিল যে পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে যায়। তাকে রিফা বিন রাফে বন্দি করেছিলেন। তার পিতা উমায়ের কুরাইশ দলপতিদের একজন ছিল, যে মক্কায় মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের অনেক বেশি কষ্ট দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে বদরের যুদ্ধের পর সে মুসলমান হয়ে যায়। এর বিস্তারিত বর্ণনা হলো, মুসলমান হওয়ার পূর্বে উমায়ের ও সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা একদিন মক্কায় হাতীমের কাছে বসা ছিল। সাফওয়ান তখনও মুসলমান হয় নি। তারা উভয়ে বদরের যুদ্ধে নিজেদের পরাজয় এবং তাদের বড়ো বড়ো সর্দারদের বিষয়ে আলোচনা করছিল যারা উক্ত যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। সাফওয়ান বলে, খোদার কসম! এই সর্দারদের নিহত হওয়ার পর জীবন যে নিরানন্দ হয়ে গেছে। উমায়ের বলে, খোদার কসম! তুমি সত্য বলছ। সে বলে যে, আমার ওপর যদি এক ব্যক্তির ঋণ না থাকত, যা পরিশোধের কোনো ব্যবস্থা আমি করতে পারছি না আর আমার পেছনে নিজ স্ত্রী-সন্তানদের কষ্টের চিন্তা না থাকত যারা আমার অবর্তমানে দারিদ্র্যে নিপতিত হতে পারে, তাহলে আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে হত্যা করে ফেলতাম। আমার সেখানে যাওয়ার যৌক্তিক কারণও রয়েছে অর্থাৎ আমার পুত্র তাদের হাতে বন্দি। একথা শুনতেই সাফওয়ান উমায়ের এর ঋণের দায়িত্ব নিয়ে নেয় আর বলে যে, তোমার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার। আমি তা পরিশোধ করে দিব। আর তোমার স্ত্রী-সন্তানরা আমার স্ত্রী-সন্তানদের সাথে থাকবে। আর যতদিন তারা জীবিত থাকবে আমি তাদের ভরণপোষণ ও লালনপালনের দায়িত্ব নিচ্ছি। তুমি যাও আর মুহাম্মদ (সা.)-কে (নাঊযুবিল্লাহ্) হত্যা করে ফেলো। উমায়ের একথা শুনতেই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। সে সাফওয়ানকে বলে, আমার ও তোমার মাঝে যে কথা হয়েছে তা গোপন রাখবে। সাফওয়ান এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয়। উমায়ের ঘরে গিয়ে নিজের তরবারি বের করে, তাতে ধার দেয়, সেটি বিষে ডুবিয়ে মক্কা থেকে যাত্রা করে মদীনায় যায়। উমায়ের যখন মসজিদে নববীতে পৌঁছে তখন সেখানে হযরত উমর (রা.) অন্য কতিপয় মুসলমানের সাথে বসা ছিলেন আর বদরের যুদ্ধের বিষয়ে কথা বলছিলেন।

উমায়ের মসজিদে নববীর দ্বারে নিজের উটনী বসাতেই হযরত উমরের দৃষ্টি তার ওপর পড়ে যে, উমায়ের তরবারি হাতে নিয়ে নামছে। হযরত উমর তাকে দেখতেই বলেন, খোদার এই শত্রু উমায়ের বিন ওয়াহাব নিশ্চয় কোনো বদ দুরভিসন্ধি নিয়ে এখানে এসেছে। এরপর হযরত উমর দ্রুত সেখান থেকে উঠে মহানবী (সা.)-এর কাছে তাঁর পবিত্র হুজরায় যান এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! খোদার এই শত্রু উমায়ের বিন ওয়াহাব নগ্ন তরবারি নিয়ে এখানে এসেছে। তিনি (সা.) বলেন, চিন্তার কিছু নেই, তাকে আমার কাছে ভেতরে নিয়ে এসো। হযরত উমর সোজা উমায়ের-এর কাছে আসেন আর তরবারির যে বন্ধনী তার গলায় ঝুলানো ছিল সেটি শক্তহাতে ধরে উমায়েরকে নিয়ে যান। হযরত উমরের সাথে তখন যে আনসার মুসলমানরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাদেরকে হযরত উমর বলেন যে, আমার সাথে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর কাছে চলো এবং তাঁর (সা.) কাছেই বসবে, কেননা আমি তার বিষয়ে আশ্বস্ত হতে পারছি না। এরপর হযরত উমর (রা.) তাকে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে ভেতরে আসেন। মহানবী (সা.) যখন দেখেন যে, হযরত উমর (রা.) এরূপ অবস্থায় আসছেন যে, তিনি নিজ হাতে উমায়ের এর তরবারির সেই বন্ধনী দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছেন যা তার গলায় ঝুলানো ছিল, তখন তিনি বলেন, হে উমর! তাকে ছেড়ে দাও। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, উমায়ের! কাছে এসো। উমায়ের নির্দেশ অনুসারে কাছে আসে এবং সে অজ্ঞতার যুগের প্রথানু যায়ী 'আনআমু ওয়া সাওয়াহান' বলে সালাম জানায়। তিনি (সা.) বলেন, উমায়ের! ইসলাম আমাদেরকে তোমার এই সম্ভাষণের চেয়ে উত্তম সম্ভাষণ দ্বারা সম্মানিত করেছেন যা জান্নাতবাসীদের সালাম। তোমার আসার উদ্দেশ্য কী ?উমায়ের বলে, আমি আমার বন্দি অর্থাৎ আমার পুত্রের বিষয়ে কথা বলতে এসছি যে আপনাদের হাতে বন্দি রয়েছে। আমার অনুরোধ হলো এই বিষয়ে আপনারা উত্তম ও সদ্‌ব্যবহার করুন। তিনি (সা.) তার নগ্ন তরবারি দেখে বলেন, তাহলে এই তরবারির অর্থ কী? উমায়ের বলে, খোদা এই তরবারিকে ধ্বংস করুন, আপনি কি আমাদের কোনো কিছুর যোগ্য রেখেছেন! এই তরবারি পূর্বেই বা কবে আমাদের সঙ্গ দিয়েছে! তিনি (সা.) বলেন, আমাকে সত্যি কথা বলো, তুমি কী উদ্দেশ্যে এসেছ? তিনি তার কথায় বিশ্বাস করেন নি। উমায়ের বলে, আমি আসলেই আমার বন্দি সম্পর্কে কথা বলা ছাড়া অন্য

কোনো উদ্দেশ্যে আসি নি। তখন তিনি (সা.) বলেন, না, বরং একদিন তুমি ও সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা হাতীমের কাছে বসে ছিলে আর কুরাইশদের সেসব নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে কথা বলছিলে যাদেরকে বদরের যুদ্ধে হত্যা করে গর্তে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তখন তুমি সাফওয়ানকে বলেছিলে যে, যদি আমার ওপর একটি ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব না থাকত আর নিজ স্ত্রী-সন্তানদের চিন্তা না থাকত তাহলে আমি গিয়ে মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করে ফেলতাম। সাফওয়ান আমাকে হত্যার শর্তে তোমার ঋণ পরিশোধের এবং স্ত্রী-সন্তানদের দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। মহানবী (সা.)-কে এসব কথা আল্লাহ্ তা'লা পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এভাবে কথা হয়েছে। রেওয়ায়েতে লেখা আছে, সে একথা শুনতেই তাৎক্ষণিকভাবে বলে ওঠে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্‌র রসূল। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার কাছে আকাশ হতে এসব সংবাদ আসে অথচ আপনার প্রতি যে-সব ওহী অবতীর্ণ হয় আমরা সেগুলো প্রত্যাখ্যান করতাম। বাকি থাকল সেই ঘটনা; তো সেই সময় হাতীমের কাছে আমি ও সাফওয়ান ছাড়া তৃতীয় কোনো ব্যক্তি উপস্থিত ছিল না। আর অন্য কেউ আমাদের এই কথোপকথন সম্পর্কে জানেনা। তাই খোদার কসম! আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া আপনাকে আর কেউ এর সংবাদ দিতে পারে না।

অতএব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য যিনি ইসলামের প্রতি আমাদের পথনির্দেশ ও হেদায়েত দান করেছেন। আর আমাকে এই পথে চলার তৌফিক দান করেছেন। এরপর উমায়ের কলেমা শাহাদাত পাঠ করেন। অতঃপর মহানবী (সা.) সাহাবীদের বলেন, তোমাদের ভাইকে ধর্ম শিখাও আর তাকে পবিত্র কুরআন পড়াও এবং তার বন্দিকে মুক্ত করে দাও। সাহাবীরা তাৎক্ষণিকভাবে নির্দেশ পালন করেন।

এরপর হযরত উমায়ের মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি সর্বদা আল্লাহ্‌র জ্যোতিকে নির্বাপিত করার চেষ্টায় রত থাকতাম আর যারা আল্লাহ্‌র ধর্মকে গ্রহণ করেছিল তাদেরকে অনেক কষ্ট দিতাম। সুতরাং এখন আমি পছন্দ করব যে, আপনি আমাকে মক্কায় যাওয়ার অনুমতি দিন যেন সেখানে গিয়ে মক্কার অধিবাসীদের আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান জানাতে পারি আর ইসলামের তবলীগ করতে পারি। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে হেদায়েত দান করবেন। নতুবা এরপর আমি তাদেরকে তাদের মূর্তিপূজার কারণে সেভাবেই কষ্ট দিব যেভাবে আমি ইসলাম গ্রহণের কারণে আপনার সাহাবীদের কষ্ট দিয়ে এসেছি। মহানবী (সা.) তাকে মক্কায় যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দেন তবে কষ্ট দেওয়ার জন্য নয় বরং তবলীগের উদ্দেশ্যে। অতএব তিনি মক্কায় ফিরে যান। আর তার পুত্র ওয়াহাব বিন উমায়েরও মুসলমান হয়ে যান।

এদিকে উমায়ের এর মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার পর সাফওয়ান মানুষকে বলে বেড়াতো যে, আমি তোমাদের এমন এক ঘটনার সুসংবাদ দিব যা খুব শীঘ্র ঘটতে যাচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে তোমরা বদরের যুদ্ধের দুর্বিপাক ও কষ্টের কথা ভুলে যাবে। সাফওয়ান প্রত্যেক আগমনকারী আরোহীর কাছে উমায়ের-এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত। অবশেষে এক ব্যক্তি বাহনে বসে মক্কায় পৌঁছে এবং সে সাফওয়ানকে বলে যে, উমায়ের ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সাফওয়ান অঙ্গীকার করে যে, কখনো তার সাথে কথা বলব না এবং কখনো তার কোনো উপকার করব না। এরপর উমায়ের মক্কায় পৌঁছেন, এখন তিনি মুসলমান। প্রথমে তিনি সাফওয়ানের ঘরে যান নি বরং সোজা নিজের ঘরে যান। সেখানে তিনি পরিবারের সদস্যদের সামনে নিজের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন এবং তাদেরকে মুসলমান হওয়ার আহ্বান জানান। সাফওয়ান যখন একথা জানতে পারে তখন সে বলে, আমি বুঝে গিয়েছি যে, কেন সে প্রথমে আমার কাছে আসার পরিবর্তে নিজের ঘরে গিয়েছে। সে ধর্মচ্যুত ও পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। আমি এখন আর কখনো তার সাথে কথা বলব না। আর সে এবং তার পরিবার আর কখনো আমার দ্বারা উপকৃত হবে না।

মুশরিকরাও নিজেদের শিরককে ধর্ম মনে করত আর এক খোদার ইবাদতকে পথভ্রষ্টতা জ্ঞান করত। আজকালও একই অবস্থা বিরাজমান।

এরপর উমায়ের সাফওয়ান বিন উমাইয়্যার কাছে যান এবং তাকে ডেকে বলেন, তুমি আমাদের সর্দারদের মাঝে একজন সর্দার। তুমি ভালো করে জানো যে, আমরা পাথরের পূজা করতাম এবং তাদের জন্য কুরবানী করতাম। এটি কি কোনো ধর্ম হলো! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং (আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,) মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল। কিন্তু সাফওয়ান উমায়ের-এর কথার কোনো উত্তরও দেয় নি আর তার প্রতি কর্ণপাতও করে নি। (আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৬৮-২৭০)

এই ঘটনা সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান নাবিয়্যিন পুস্তকেও লিখেছেন যে, মক্কার কাফিররা, যারা এর পূর্বে কেবল বাহ্যিক বাহুবল ও অহংকারের ভিত্তিতে লড়াই করছিল এখন এক খোলা মাঠে মুসলমানদের কাছে পরাজিত হয়ে গোপন ষড়যন্ত্র করা আরম্ভ করে। যেমন এই ঐতিহাসিক ঘটনা, যা বদরের যুদ্ধের মাত্র কয়েক দিন পর ঘটেছে, উক্ত আশংকার এক স্পষ্ট উদাহরণ। লেখা আছে যে, বদরের যুদ্ধের কয়েক দিন পর উমায়ের বিন ওয়াহাব এবং সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা বিন খালফ জাউযি, যারা প্রভাবশালী কুরাইশদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কা'বা প্রাঙ্গনে বসে বদরের যুদ্ধে নিহতদের জন্য হাহুতাশ করছিল। আর সেসব কথাই বলছিল যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তিনি (রা.) এখানে লিখেছেন যে, সেসব কথা তারা বলছিল। অর্থাৎ এটিই বলছিল যে, এখন জীবনের সকল আনন্দ হারিয়ে গেছে, আর উমায়ের এটিও বলে যে, যদি আমার ঋণ বাদ না সাধতো আর আমার সন্তানদের চিন্তা না থাকত তা হলো

নিজের প্রাণ বিপন্ন করতে প্রস্তুত আছি। অধিকন্তু আমার তাদের কাছে যাওয়ার একটি অজুহাতও রয়েছে যে, আমার সন্তান তাদের হাতে বন্দি রয়েছে। সেখানে গিয়ে আমি নাঊযুবিল্লাহ্ মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করে ফেলব। যাহোক এরপর সাফওয়ান ঋণ পরিশোধ এবং সন্তানদের লালনপালন সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দেয়, যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর তিনি (রা.) এখানে এটিও লিখেছেন যে, এরপর উমায়ের নিজের ঘরে ফিরে আসে। তরবারি বিষে ডুবিয়ে মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়ে। সে মদীনায় পৌঁছলে হযরত উমর (রা.), যিনি এসব বিষয়ে বেশ চৌকস ছিলেন, তাকে দেখে কিছুটা শঙ্কিত হন, আর তৎক্ষণাৎ মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে নিবেদন করেন যে, উমায়ের এসেছে এবং আমি তার বিষয়ে আশ্বস্ত নই। মহানবী (সা.) বলেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। হযরত উমর তাকে আনতে যান। যাওয়ার সময় সাহাবাদের বলে গেলেন, উমায়েরকে মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাত করানোর জন্য আনতে যাচ্ছি। তার বিষয়ে আমি কিছুটা সন্দিহান। তোমরা মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে বসে থাকো এবং চৌকস থাকবে। এরপর হযরত উমর (রা.) উমায়েরকে সাথে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন। তিনি (সা.) তাকে বিনম্রভাবে নিজের পাশে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, উমায়ের! তোমার আগমনের হেতু কী? সে বলল, আমার ছেলে আপনাদের কাছে বন্দি অবস্থায় আছে, তাকে মুক্ত করতে এসেছি। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তুমি তরবারি কেন ঝুলিয়ে রেখেছ? তরবারি কেন গলায় ঝুলিয়ে রেখেছ? সে বলে, আপনি তরবারির কথা বলছেন! বদরে তরবারি আমাদের কী কাজে এসেছে? খুব চতুরতার সাথে কথা বলতে থাকে। তিনি (সা.) বললেন, সত্য করে বলো, কী উদ্দেশ্যে এসেছ? সে বলে, উক্ত উদ্দেশ্যেই যা আমি একটু আগেও বলেছি অর্থাৎ আমি আমার পুত্রকে মুক্ত করতে এসেছি। তিনি (সা.) বলেন, আচ্ছা, তাই নাকি! তুমি সাফওয়ানের সাথে মিলে কা'বার চত্তরে কোনো ষড়যন্ত্র করো নি? [তিনি (সা.) তার ষড়যন্ত্রের দিকে ইঙ্গিত করলেন]। উমায়ের এ কথা শুনে নিরব-নিথর হয়ে যায় কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, না, আমি কোনো ষড়যন্ত্র করি নি। তিনি (সা.) বললেন, তুমি কি আমাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করো নি? কিন্তু স্মরণ রেখ! খোদা তোমাকে আমার কাছে আসার সু যোগ দিবেন না। উমায়ের গভীর চিন্তায় ডুবে গেল আর বলল, আপনি সত্য বলেছেন। আমরা সত্যিই এমন ষড়যন্ত্র করেছিলাম তবে মনে হয় যেন খোদা সহায় আছেন যিনি আপনাকে আমাদের অভিপ্রায়ের বিষয়ে অবগত করে দিয়েছেন। অন্যথায় যখন সাফওয়ানের সাথে আমার কথা হয়েছিল তখন সেখানে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি উপস্থিত ছিল না। আর খুব সম্ভব খোদা তা'লা আমার ঈমান আনার সুবিধার্থে এমনটি করিয়েছে। আমি সত্যনিষ্ঠ হৃদয়ে আপনার প্রতি ঈমান আনছি।

মহানবী (সা.) উমায়েরের ইসলাম গ্রহণে আনন্দিত হন এবং সাহাবীদের বলেন, এ এখন থেকে তোমাদের ভাই। তাকে ইসলামের শিক্ষা সম্বন্ধে অবগত করো। আর তার বন্দিকে মুক্ত করে দাও। মোটকথা, উমায়ের বিন ওয়াহাব মুসলমান হয়ে গেলেন। আর খুব দ্রুত ঈমান ও নিষ্ঠায় উন্নতি সাধন করেন। আর অবশেষে সত্যের জ্যোতির প্রতি এতটাই অনুরাগী হয়ে পড়েন যে, মহানবী (সা.)-এর কাছে বারবার এ নিবেদন করলেন, আমাকে মক্কা যাওয়ার অনুমতি দিন যেন আমি সেখানকার লোকদের গিয়ে তবলীগ করতে পারি। মহানবী (সা.) অনুমতি দিলেন আর উমায়ের মক্কায় গিয়ে সফল তবলীগের মাধ্যমে গোপনে বেশ কিছু লোককে মুসলমান বানিয়ে ফেলেন। সাফওয়ান, যে কিনা অহরাত্রি মহানবী (সা.)-এর নিহত হওয়ার খবর শোনার জন্য অপেক্ষমান ছিল আর কুরাইশদের বলত যে, তোমরা এখন সুসংবাদ শোনার জন্য প্রস্তুত থাকো, সে যখন এই অবস্থা দেখল তখন তার কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে যায়।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. পৃ: ৩৭৪-৩৭৬)

বদরের যুদ্ধের পর কিছু লোক মুসলমান হয়ে যায় কিন্তু তাদের হৃদয়ে মুনাফেকী ছিল। তাদেরই একজন ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল। আল্লামা ইবনে কাসীর সূরা বাকারার ০৯ ও ১০ নম্বর আয়াতের তফসীরে লিখেন, যখন বদরের যুদ্ধের ঘটনা ঘটে এবং আল্লাহ্ তা'লা নিজ কলেমাকে বিজয়ী করেন আর ইসলাম এবং ইসলামের অনুসারীদের সম্মানিত করেন তখন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল যে মদীনার নেতা এবং বনু খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিল আর অজ্ঞতার যুগে এই উভয় গোত্র তথা অওস ও

খাযরাজ গোত্রের সর্দার ছিল, তাদের মাঝে মতৈক্য ছিল যে,সে তাদের নেতৃত্ব দিবে। (অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলকে নিজেদের সর্দার বানাচ্ছিল)। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী কিছু লোক একটি মুকুট বানিয়ে তাকে বাদশা বানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল, ঠিক তখনই কল্যাণ এসে উপস্থিত হয় অর্থাৎ ইসলামের বার্তা এসে পেঁৗছে এবং লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে আর তাকে ভুলে যায়। এ কারণেই ইসলাম এবং ইসলামের অনুসারীরা তার মনোপীড়ার কারণ হয়। বদরের যুদ্ধ যখন সংঘটিত হয় তখন সে দেখে যে, এটি তথা ইসলাম যে বিজয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। প্রথমে সে ভেবেছিল, এরা তো গুটিকয়েক লোক। কিন্তু বদরের যুদ্ধে যখন মুসলমানদের বিজয় লাভ হয় তখন সে কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়ে। ফলে যদিও সে বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করে আর তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার অনুসারী এক জামা'ত বা দল ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। কিছু আহলে কিতাবও তাদের সাথে ছিল।

(তফসীর ইবনে কাসীর, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮৭) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪১৮)

এ সম্পর্কে মির্যা বশীর আহমদ (রা.) এভাবে লিখেছেন- তখন পর্যন্ত মদীনার অওস ও খাযরাজ গোত্রের অনেক লোক শিরকে অবিচল ছিল। বদরের বিজয় তাদের মাঝে এক প্রকার জাগরণ সৃষ্টি করে, তাদের অনেকেই মহানবী (সা.)-এর এই মহান ও অসাধারণ বিজয় দেখে ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। আর এরপর মদীনায় মূর্তিপূজারি লোক খুব দ্রুত হ্রাস পেতে শুরু করে। কিন্তু কিছু এমন লোকও ছিল যাদের হৃদয়ে ইসলামের এমন বিজয় ঘৃণা ও হিংসার স্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত করে এবং বাহ্যত তারা প্রকাশ্যে বিরোধিতা করাকে যথার্থ কাজ হবে জ্ঞান করেবাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করলেও ভেতরে ভেতরে এটিকে নির্মূল করার সংকল্প নিয়ে মুনাফিকদের দলে যোগ দান করে। এই শেষোক্ত ব্যক্তিবর্গের মাঝে সবচেয়ে স্ব তন্ত্র মর্যাদা রাখত আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলূল যে কিনা খাযরাজ গোত্রের অনেক প্রসিদ্ধ একজন নেতা ছিল। রসূল (সা.)-এর মদীনায় আগমনের কারণে নিজের নেতৃত্ব হারানোর বেদনায় বিহ্বল ছিল। এই ব্যক্তি বদরের পর বাহ্যত মুসলমান হয়ে যায়, কিন্তু তার হৃদয় ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও শত্রুতায় পরিপূর্ণ ছিল এবং সে মুনাফিক সর্দার হয়ে গোপনে গোপনে ইসলাম ও রসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মূলক কর্মকাণ্ড আরম্ভ করে দেয়। যেমন কিনা পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ থেকে জানা যায় যে, সে কীভাবে বিভিন্ন সময়ে ইসলামের জন্য চরম বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টির কারণ হয়েছিল।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. পৃ: ৩৭৬-৩৭৭)

এর একটি আলাদা দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।

বনু সুলায়েমের যুদ্ধ বা কারকারাতুল কুদর। রসূলুল্লাহ (সা.) যখন বদরের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন এর কিছুদিন পরে তিনি (সা.) সংবাদ পান যে, বনু সুলায়েম এবং বনু গাতফানের লোকেরা কারকারাতুল কুদর নামক স্থানে একত্রিত হয়েছে। মদীনায় আক্রমণের পরিকল্পনা করছে। কারকারাতুল কুদর একটি অনুর্বর ময়দানের একটি ঝরনার নাম। এটি নাজদ-এর রাস্তায় মক্কা হতে সিরিয়া যাওয়ার পথে মদীনা হতে ৯৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত।

যাহোক,এই খবর পাওয়া মাত্রই রসূলু ল্লাহ (সা.) বনু সালমান ও গাতফানের বিরুদ্ধে স্বয়ং প্রথমে পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার সিদ্ধান্ত নেন। সেই উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ (সা.) তিনশত সাহাবীর বাহিনী নিয়ে স্বয়ং কারকারাতুল কুদর-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

যদিও যুদ্ধে রওনার বিষয়ে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। ইবনে ইসহাক-এর বর্ণনানুসারে রসূলুল্লাহ (সা.) বদরের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের সাত দিন পর রমযানের শেষে বা শাওয়াল মাসের শুরুতে দ্বিতীয় হিজরি সনে এই অভিযানে বের হয়েছিলেন। তাবকাতে ইবনে সা'দে লেখা আছে, বনু সুলায়েমের যুদ্ধ ষষ্ঠ জমাদিউল উলাতে সংঘটিত হয়েছিল। ওয়াকিদির মতানুসারে এই যুদ্ধ মুহাররমের মাঝামাঝি সময় তৃতীয় হিজরিতে সংঘটিত হয়েছিল। ওয়াকিদির বর্ণনা সাধারণত দু র্বল হয়ে থাকে। এই অভিযানের নেতৃত্ব স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা.) দিয়েছেন এবং পতাকাবাহক ছিলেন হযরত আলী (রা.) এবং ইসলামের পতাকার রং ছিল সাদা।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৮১) (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৭) (আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে ইসহাক, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩১৯) (কিতাবুল মাগাযি লিল ওয়াকদি, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৮২) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ২৪২)

মহানবী (সা.) মদীনায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাকতুম (রা.) -কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। এটিও বলা হয়ে থাকে যে, রসূলুল্লাহ (সা.) সেই সময় সিবা বিন উরফাতা গাফারি (রা.)-কে মদীনায় তাঁর নায়েব নিযুক্ত করেছিলেন। যাইহোক, উভয় কথার ব্যাখ্যা এভাবে করা হয় যে, হযরত সিবা বিন উরফাতা গাফারিকে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাকতুমকে রীতি অনুসারে নামাযের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। (সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৮০)

যাহোক, শত্রুরা যখন জানতে পারে যে, ইসলামী সেনাবাহিনী আসছে, তিনশত মানুষ আসছে, বনু সুলায়েমের ও বনু গাতফানের লোকেরা আকস্মিকভাবে সংবাদ পায়, তাদের জন্য এটি অপ্রত্যাশিত ছিল। তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সেখান থেকে পালায় আর পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে আশ্রয় নেয়।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৬)

মহানবী (সা.) মুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে কুদর উপত্যকায় পৌঁছালে তিনি (সা.) উটের পায়ের ছাপ ছাড়াও ঝরনাও দেখতে পান কিন্তু মহানবী (সা.) সেখানে শত্রুপক্ষের কাউকে দেখতে পান নি।

(কিতাবুল মাগাযি লিল ওয়াকদি, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৮২)

মহানবী (সা.) সাহাবীদের একটি দলকে উপত্যকার উঁচুভূমির দিকে প্রেরণ করেন এবং স্বয়ং বিনা বাধায় উপত্যকার কেন্দ্রস্থলে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি (সা.) সেই গোত্রগুলোর কতক রাখালকে দেখতে পান। তাদের মাঝে ইয়াসার নামে একজন দাসও ছিল। তিনি (সা.) তাদেরকে বনু সুলায়েম এবং গাতফান গোত্রের লোকজন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। জবাবে সে বলে, তাদের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। আমি তো কেবল উটগুলোকে পানি পান করাই। কতকের পঞ্চম দিনে, কতকের চতুর্থ দিনে পান করানোর পালা আসে। স্থানীয়রা ঝরনার পথ ধরে উপরে চলে গিয়েছে এবং আমরা উটের পালের সাথে আছি তাই এ বিষয়ের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। যাহোক, এরা যেহেতু যুদ্ধ করার নিমিত্তেই এসেছিল, সেখানে তাদের সাজসরঞ্জাম ছিল; তাই মহানবী (সা.) উটগুলোকে করায়ত্ত করেন এবং রাখালদের বন্দি করেন। তিনি (সা.) সেখানে তিন রাত অবস্থান করেন। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি (সা.) দশ রাত অবস্থান করেন।

তিনি (সা.) যতদিন সেখানে ছিলেন তাঁর মোকাবিলা করার কারো বুকের পাটা হয় নি। এভাবে মহানবী (সা.) বিনাযুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ফেরত আসেন।

(শারাহ যারকানি আলা মোয়াহিবিল লাদানি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৫)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) মালে গনিমত হিসেবে যে উট লাভ করেন তার সংখ্যা ছিল পাঁচশো। তারা যেহেতু যুদ্ধের উদ্দেশ্যে এসেছিল এবং তারা ধনসম্পদ ফেলে রেখে গিয়েছিল। তাই তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী তাদের সেই সম্পদ নিয়ে আসা বৈধ ছিল। সেগুলো ছিল মালে গনিমত। মহানবী (সা.) এর খুমস্ বা এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করেন এবং অবশিষ্টাংশ চারশো মসুলমানের মধ্যে বণ্টন করে দেন। মুজাহিদরা মাথাপিছু ২টি করে উট লাভ করেন। এই সেনাবাহিনী দুইশো মুজাহিদ সংবলিত ছিল। ইয়াসার তাঁর (সা.) ভাগে পড়েছিল। তিনি (সা.) তাঁকে স্বাধীন করে দেন। সেই রাখালকে মুক্ত করে দেন। মহানবী (সা.) এই অভিযানের উদ্দেশ্যে পনেরো দিন পর্যন্ত মদীনার বাইরে ছিলেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সীরাতি খাইরিল ইবাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৭২)

এর বিস্তারিত বিবরণ হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব তাঁর সীরাত খাতামান নাবিয়্যিন পুস্তকে বলেন, হিজরতের পরে মক্কার কুরাইশরা আরবের বিভিন্ন গোত্রসমূহে ঘুরে ঘুরে অনেক গোত্রকে মুসলমানদের প্রাণের শত্রুতে পরিণত করে ফেলে। ক্ষমতা ও জনশক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে এই গোত্রগুলোর মধ্যে মধ্য আরব তথা নাজদের দুটি গোত্র ছিল বেশি গুরুত্বর্পূ , যেগুলোর নাম বনু সালীম ও বনু গাতফান। মক্কার কুরাইশরা সেই দু টি গোত্রকে বিশেষভাবে নিজেদের সাথে জোটবদ্ধ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং স্যার উইলিয়াম ম্যুর লিখেন, মক্কার কুরাইশরা নাজদ এলাকার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আর এই এলাকার গোত্রগুলোর সাথে পূর্বের চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে। বনু সুলায়েম এবং গাতফান গোত্র মুহাম্মদ (সা.)-এর ঘোরতর শত্রু হয়ে যায় আর এই শত্রুতাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। কুরাইশদের উস্কানি এবং আবু সুফিয়ানের ব্যবহারিক আচারাচরণের জের হিসেবে তারা মদীনায় আক্রমণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। "

এ ব্যক্তি একজন প্রাচ্যবিদ, সে-ও একথা স্বীকার করে যে, তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মদীনাতে আক্রমণ করতে চাইত। কাজেই তাদের সাথে যে ব্যবহারই করা হয়েছে আর যে মালে গনিমত হস্তগত হয়েছে তা সম্পূর্ণ জায়েয(বৈধ) ছিল।

যাহোক, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, মহানবী (সা.)-এর বদর থেকে ফেরার পর মদীনাতে মাত্র ক'দিনই কাটতেই তিনি (সা.) সংবাদ লাভ করেন যে, সুলায়েম ও গাতফান গোত্রের একটি বড়ো সেনাবাহিনী মদীনায় আক্রমণের উদ্দেশ্যে কারকারাতাল কুদরে একত্রিত হচ্ছে। বদরের যুদ্ধের এত নিকটবর্তী সময়ে এত দ্রুত এ সংবাদপ্রাপ্তি এটি স্পষ্ট করে যে, যখন কুরাইশ সেনাবাহিনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হয়েছিল তখনই কুরাইশ নেতারা সুলায়েম ও গাতফান গোত্রকে এ সংবাদ প্রেরণ করে থাকবে যে, তোমরা অপরদিক থেকে মদীনায় আক্রমণ করো। অথবা এটিও হতে পারে যে, আবু সুফিয়ান যখন নিজ গোত্রের সাথে প্রাণে বেঁচে ফেরত যায় তখন সে কোন দূতের মাধ্যমে সেই গোত্রগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বের হতে উস্কানি দেয়। যাহোক, মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধ শেষে মদীনায় পৌঁছা মাত্রই এ আশঙ্কাজনক সংবাদ এসে পৌঁছে যে, সুলায়েম ও গাতফান গোত্র মুসলমানদের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ

সংবাদ শুনে মহানবী (সা.) দ্রুত সাহাবীদের একটি দল নিয়ে প্রীএমটিভ (দূরদর্শিতামূলক) পদক্ষেপ হিসেবে নাজদের দিকে যাত্রা করেন, কিন্তু তিনি (সা.) কয়েকদিনের কষ্টকর সফর অতিক্রম করে যখন কারকারাতাল কুদর অর্থাৎ তৃণলতাশূন্য ময়দানে পৌঁছেন তখন জানতে পারেন, বনু সুলায়েম ও বনু গাতফান-এর লোকেরা ইসলামী সেনাবাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে পাশের পাহাড়গুলোতে গিয়ে লুকিয়েছে। মহানবী (সা.) তাদের অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের একটি ছোটো দল প্রেরণ করেন এবং নিজে উপত্যকার মূল বসতির দিকে অগ্রসর হন, কিন্তু তাদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। তবে তাদের বিশাল এক উষ্ট্রপাল পান যা উপত্যকার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, যা তৎকালীন যুগের যুদ্ধের নিয়মানুযায়ী সাহাবীরা করায়ত্ব করে নেয় আর এরপর মহানবী (সা.) মদীনায় ফেরত চলে আসেন। সেই উটগুলোর রাখাল ইয়াসার নামে এক দাস ছিল যাকে উটের সাথে বন্দি করা হয়েছিল। তার উপর মহানবী (সা.)-এর সাহচর্যের এতটা প্রভাব পড়েছিল যে, অল্প সময়ের মধ্যেই সে মুসলমান হয়ে যায় আর যদিও মহানবী (সা.) কৃপাবশত তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, কিন্তু সে আমৃত্যু মহানবী (সা.)-কে ছেড়ে যায় নি।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা- হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৪৫২-৪৫৩)

অতঃপর মুসলমানদের প্রথম ঈদুল ফিতর যা দ্বিতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে পালন করা হয়েছিল এ সম্পর্কে লিপিবদ্ধ আছে, হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে রমযান মাসের পরিসমাপ্তিতে তিনি (সা.) প্রথমবার ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন করেন।

(দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৬২)

মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, অজ্ঞতার যুগে তোমরা যে দুই দিন আনন্দ উদ্‌যাপন করতে সেগুলোর বাস্তবতাও মর্যাদা কী? সেখানকার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে নিবেদন করা হলো, আমরা পূর্বে ঠিক তদ্রুপভাবে ধর্মীয় উৎসব পালন করতাম যেমনটি এখনো প্রচলিত আছে। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জন্য এই দুই উৎসবের চেয়ে দুটো উত্তম দিন নির্ধারণ করেছেন। সাহাবীরা আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! সেই দিনগুলো কোন কোনটি? মহানবী (সা.) বললেন, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। সেই দিনগুলোতে কেউ যেন রোযা না রাখে, বরং পানাহার করে এবং আনন্দ উদ্‌যাপন করে। এই দুই ঈদে তিনি ঈদগাহে যেতেন। ঈদগাহ মদীনার পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। তিনি ঈদের দিন এক পথে ঈদগাহে যেতেন আর আরেক পথে ফিরে আসতেন। এটি শোভাযাত্রার রূপ ধারণ করত এবং অমুসলমানরা প্রতাপান্বিত হতো। একবার তিনি ঈদুল ফিতরের নামায মসজিদে নববীতে পড়েছিলেন, কেননা সেদিন নামাযের সময় ভারি বর্ষণ হচ্ছিল।

(সীরাতুন নবীর এনসাইক্লোপেডিয়া, প্রণেতা- সৈয়্যদ কাসেম মাহমুদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪১১)

ঈদ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন, ঈদুল ফিতর সম্পর্কে যা লিপিবদ্ধ আছে তা হলো, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পর রমযানের শেষ প্রান্তে মহানবী (সা.) খোদার আদেশপ্রাপ্ত হয়ে ফিতরানার নির্দেশ দেন। অর্থাৎ প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমান নিজের, পরিবারের এবং অধীনস্থদের প্রত্যেকের পক্ষ থেকে এক সা খেজুর বা আঙু র অথবা জব কিংবা গম প্রভৃতি সদকা হিসেবে ঈদের পূর্বে আদায় করবে আর এই সদকা দরিদ্র, মিসকিন, এতিম ও বিধবাদের মাঝে বিতরণ করা হবে যেন সামর্থ ্যবানদের পক্ষ থেকে এটি রোযার ইবাদতসমূহে দুর্বলতার প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায় আর ঈদের সময় দরিদ্রদের সাহায্য-সহযোগিতার একটি সুযোগ সামনে আসে। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে প্রত্যেক ঈদুল ফিতরের পূর্বে নিয়মিতভাবে সদকাতুল ফিতর বা ফিতরানা সকল ছোটো-বড়ো, নারীপুরুষ মুসলমানের পক্ষ থেকে আদায় করা হতো আর তা এতিম, দরিদ্র এবং মিসকীনদের মাঝে বণ্টন করা হতো।

ঈদুল ফিতরও সে বছরই আরম্ভ হয়েছিল অর্থাৎ, মহানবী (সা.) আদেশ দিয়েছিলেন, রমযান মাস শেষ হলে শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে মুসলমানরা যেন ঈদ উদ্‌যাপন করে।

এই ঈদ এই আনন্দের বহিঃপ্রকাশস্বরূপ হয় যে, আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে রমযান মাসে ইবাদত করার সৌভাগ্য দান করেছেন। কিন্তু এটি কত চমৎকার চিত্তাকর্ষক বিষয় যে, তিনি (সা.) এই আনন্দের বহিঃপ্রকাশের জন্যও একটি ইবাদতই নির্ধারণ করেছেন।

সুতরাং তিনি (সা.) আদেশ দেন, ঈদের দিন সকল মুসলমান কোনো খোলা মাঠে সমবেত হয়ে প্রথমে দুই রাকাত নামায আদায় করবে। নামায আদায়ের পর বৈধ আনন্দোল্লাসও করতে পারে, কেননা আত্মার আনন্দের সময় দেহেরও আনন্দের অংশ হওয়ার অধিকার রয়েছে। মোটকথা, ইসলাম সমষ্টিগত এসব বড়ো বড়ো ইবাদতের শেষে ঈদ রেখেছে। যেমন নামাযের ঈদ হলো জুমুআ যা পুরো সপ্তাহের নামাযের পর আসে এবং যাকে ইসলামে সকল ঈদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ঈদ আখ্যায়িত করা হয়েছে। তারপর রোযার ঈদ হলো ঈদুল ফিতর, যা রমযানের পর আসে আর হজ্জের ঈদ হলো ঈদুল আযহা যা হজ্জের দ্বিতীয় দিন উদ্‌যাপন করা হয়। এই সমস্ত ঈদ স্বয়ং নিজগুণে এক প্রকার ইবাদত। বস্তুত ইসলামের ঈদগুলো নিজেদের মাঝে এক অদ্ভুত মহিমা রাখে। এর মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ওপর আলোকপাত হয় আর প্রণিধানের সুযোগ লাভ হয় যে, ইসলাম কীভাবে মুসলমানদের সকল কাজকে আল্লাহ তা'লার যিকরের সাথে সম্পৃক্ত করতে চায়।"

অতএব এটি হলো ঈদের গুরুত্ব। সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, এগুলো কেবল আনন্দোৎসব নয় বরং আল্লাহ তা'লাকে স্মরণ করা উচিত এবং তার ইবাদতও করা উচিত।

তিনি বলেন, ইতিহাস থেকে বিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা হয় নতুবা আমি বলতাম, ইসলাম কীভাবে খোদা তা'লার স্মরণকে একজন মুসলমানের প্রতিটি গতিবিধি এবং কথা ও কর্মের অন্তর্নিহিত বিশেষত্ব নির্ধারণ করছে। এমনকি দৈনন্দিন সাধারণ উঠা-বসায়, চালচলনে, শয়নে-জাগরণে, পানাহারে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায়, কাপড় পরিধানে, জুতা পরিধানে, ঘর থেকে বের হওয়া ও প্রবেশ করায়, সফরে যাওয়া এবং সফর থেকে ফেরত আসায়, কোন বস্তুর ক্রয়বিক্রয়ে, উঁচু স্থানে আরোহণ ও নিম্নে অবতরণে, মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ায়, বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতে, শত্রুর মোকাবেলায়, নতুন চাঁদ দেখায় এবং স্ত্রী গমনে; বস্তুত প্রত্যেক কাজের শুরু ও শেষে, এমনকি হাঁচি ও হাই-কে কোনোনা কোনোভাবে খোদা তা'লার স্মরণের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে।"

অতএব, এ হলো ইসলামের শিক্ষা যা প্রত্যেক সত্যিকার মুসলমানের সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যেন আল্লাহ্ তালা সকল বিষয়ে আমাদের সামনে থাকেন।

"এমতাবস্থায় আরবের মুশরিকরা যদি মহানবী (সা.) সম্পর্কে যিনি এই শিক্ষার আনয়নকারী [যদিও কাফিরদের ধারণা হলো, তিনি (সা.) এই শিক্ষার স্রষ্টা] তাঁর সম্পর্কে একথা বলে যে, মুহাম্মদ (সা.) খোদা তা'লার প্রেমে উম্মাদ হয়ে গেছেন, তবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। নিঃসন্দেহে বস্তুবাদী মানুষের কাছে এই বিষয়টি উম্মাদনা ছাড়া আর কিছুই পরিদৃষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যে নিজ অস্তিত্বের প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন করেছে সে জানে, এর নামই হলো জীবন।"

[সীরাত খাতামাননাবীঈন (সা.), প্রণেতা- হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ, পৃ: ৩৩৭-৩৩৮]

খোদা তা'লাকে সর্বদা স্মরণ রাখাই হলো প্রকৃত জীবন।

এই সময়ের মাঝে অর্থাৎ, বদরের যুদ্ধের পর এবং উহুদের পূর্বে দুটি সন্দেহপূর্ণ ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায়। অগভীর দৃষ্টিতে দেখলেও স্পষ্টতঃ বোঝা যায় যে, এগুলো বানোয়াট কাহিনি।

প্রথম ঘটনা, আসমা বিনতে মারওয়ান এর হত্যার ঘটনা। বর্ণনা করা হয় যে, তাকে হত্যা করা হয়েছে। বিস্তারিত বর্ণনায় বলা হয়েছে, হযরত উমায়ের বিন আদী খেতমী একজন অন্ধ সাহাবী ছিলেন। হযরত উমায়ের বনু খেতমা গোত্র হতে সর্বপ্রথম মুসলমান হন। সময়কাল ছিল হিজরতের দ্বিতীয় বছর আর রমযানের পাঁচ রাত অবশিষ্ট ছিল। মহানবী (সা.) উমায়ের বিন আদী খেতমীকে এক ইহুদী মহিলা আসমা বিনতে মারওয়ান এর কাছে পাঠালেন। সে মারসাদ বিন যায়েদ বিন হাসান আনসারী যিনি মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন তার স্ত্রী ছিল। আসমা বিনতে মারওয়ানকে হত্যার নির্দেশ দেবার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, সে ইসলামকে গালমন্দ করত, মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে মানু ষকে উস্কানি দিত এবং (অশোভন) কবিতা শুনিয়ে বেড়াতো। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, এই মহিলা নোংরা কাপড়চোপড় মসজিদে নববীতে ফেলে আসত। এই কাহিনি বানানোর জন্য উক্ত রেওয়ায়েতে এই বিষয়টিও অন্তর্ভু ক্ত করা হয়েছে। এভাবে সে মহানবী (সা.) ও মুসলমানদেরকে কষ্ট দিত। বলা হয়, মহানবী (সা.)-এর আদেশে হযরত উমায়ের রাতের অন্ধকারে সেই মহিলার বাড়িতে যান, তার সন্তানরা তার চারিদিকে শুয়ে ছিল এবং সে এক শিশুকে দুধ পান করাচ্ছিল। উমায়ের হাতড়িয়ে তাকে খুঁজে বের করেন এবং সন্তানকে তার থেকে পৃথক করেন। অতঃপর তিনি তার বুকে তরবারি ঠেকিয়ে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেন যার ফলে তরবারি তার কোমর ভেদ করে বেরিয়ে যায়। এ ঘটনার পর উমায়ের বিন আদী মদীনায় ফিরে এসে মহানবী (সা.)-এর পেছনে ফজরের নামায আদায় করেন। মহানবী (সা.) যখন নামায শেষে দাঁড়ান তখন তাঁর (সা.) দৃষ্টি উমায়ের-এর প্রতি নিবদ্ধ হয়। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি মারওয়ানের কন্যাকে হত্যা করেছ? তিনি (রা.) বললেন, হ্যাঁ। তবে তাকে হত্যা করার কারণে আমার কি পাপ হয়েছে? বলা হয় যে একদিকে, মহানবী (সা.) তাকে (হত্যা করার জন্য) পাঠিয়েছিলেন। অপরদিকে আদী জিজ্ঞেস করছেন, হত্যা করার কারণে আমার কি পাপ হয়েছে? এর জবাবে মহানবী (সা.) একটি অপ্রচলিত প্রবাদ বাক্য বললেন। তিনি (সা.) বলেন, لَا يَنْتَطِحُ فِيهَا عَنْزَانِ অর্থাৎ এ (হত্যার) কারণে দু টি বকরিও পরস্পর লড়াই করবে না। অর্থাৎ, এ মহিলার হত্যা এত সামান্য একটি বিষয় যে, বিরোধীরাও এর কোনো বিরোধিতা করবে না। লিপিবদ্ধ আছে, এ বাক্য বা প্রবাদ মহানবী (সা.) ছাড়া অন্য কারো মুখ হতে শুনা যায় নি। কেবল এখানেই

এরূপ একটি রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। যাহোক এ ঘটনার পর মহানবী (সা.) উমায়ের-এর নাম রাখেন 'বাসীর' অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। হযরত উমর বিন খাত্তাব বলেছিলেন, এই অন্ধকে দেখো! যে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে রাত কাটিয়েছে। তিনি (সা.) বলেন, তাকে অন্ধ বলো না, বরং তাকে চক্ষু ষ্মান বলো।

আরেকটি রেওয়ায়েতে আসমার হত্যার ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন মহানবী (সা.) আসমা বিনতে মারওয়ান-এর হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন লোকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, কেউ কি এমন আছে যে এ মহিলা থেকে আমাদের মুক্তি দিতে পারবে? প্রত্যুত্তরে উমায়ের বিন আদী বলেন, তাকে হত্যা করার দায়িত্ব আমি নিলাম। এরপর তিনি আসমার কাছে যান। সেই মহিলা তখন খেজুর বিক্রি করছিল। উমায়ের মহিলার সামনে রাখা খেজুরের দিকে ইশারা করে বলল, তোমার কাছে কি এর চেয়ে উন্নত খেজুর আছে? সে বলল, আছে। একথা বলে সে তার ঘরের ভিতরে গেল এবং খেজুর উঠানোর জন্য নীচু হলো। তিনি বলেন, আমি ডানে-বামে দেখে তার মাথায় আঘাত করলাম এবং তাকে হত্যা করে ফেললাম। তখন মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে বললেন, তোমরা যদি এমন কোনো ব্যক্তিকে দেখতে চাও যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে সাহায্য করেছে তবে উমায়ের বিন আদীকে দেখো।

একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহানবী (সা.) যখন মারওয়ানের কন্যা আসমাকে হত্যা করা বৈধ আখ্যা দেন তখন হযরত উমায়ের মানত করেছিল, আল্লাহ্ তা'লা যদি তাঁর রসূল (সা.)-কে বদরের যুদ্ধ থেকে ভালোভাবে মদীনায় পৌঁছানোর সৌভাগ্য দান করেন তবে আমি আসমা-কে হত্যা করব। যেন বদরের যু দ্ধে যাওয়ার পূর্বেই নির্দেশ দেন আর আর তিনি বলেন, যুদ্ধ থেকে ফেরার পর আমি হত্যা করব। মহানবী (সা.) যখন বিজয়ীবেশে বদর হতে মদীনা মুনাওয়ারাতে ফেরত আসেন তখন হযরত উমায়ের নিজের মানত পূর্ণ করার মানসে আসমা-এর ঘরে গিয়ে তাকে হত্যা করে। একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, আসমা বিনতে মারওয়ানকে হত্যা করার পর হযরত উমায়ের যখন এ এলাকায় ফেরত আসেন তখন সেই মহিলার ছেলে কিছু লোককে সাথে নিয়ে নিজের মাকে দাফন করছিল। উমায়েরকে দেখে তারা বলল, উমায়ের! তুমি কি তাকে হত্যা করেছ? তিনি বলেন, হ্যাঁ। অতঃপর বলেন, فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ অর্থাৎ, তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো এবং আমাকে মোটেও অবকাশ দিও না (সূরা হূদ: ৫৬)। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা সবাই মিলেও যদি সে কথা বলো যা সেই মহিলা বলত তবে আমি আমার তরবারি দিয়ে তোমাদের সবার শিরচ্ছেদ শুরু করব। এর ফলে হয় আমি শহীদ হয়ে যাব অথবা তোমাদের জাহান্নামে পাঠাব। সেই দিন থেকে বনু খেতমা গোত্রে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রসার পেতে থাকে নতুবা এর পূর্বে যারা মুসলমান হয়েছিল তারা নিজেদের মুসলমান হওয়ার কথা গোপন করত।

আল্লামা সুহায়লী লিখেছেন, আসমা-কে তার স্বামী হত্যা করেছিল এবং 'ইসতিয়াব' নামক পুস্তকে হযরত উমায়ের-এর জীবনীর অধীনে লেখা আছে, তিনি তার বোনকেও হত্যা করেছিলেন, কেননা সে মহানবী (সা.)-কে গালাগালি দিত কিন্তু ইসতিয়াব-এ উমায়ের-এর বোনের নামের উল্লেখ নেই।

(সীরাত হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৮২-৪৮৫) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২১)

এ হলো সব কাহিনি যা বর্ণনা করা হয়েছে। ইতিহাস ও সীরাতের কিছু পুস্তকে এ ঘটনা পাওয়া যায় কিন্তু সিহাহ সিত্তা এবং হাদীসের কোনো নির্ভরযোগ্য পুস্তকে এর উল্লেখ নেই।

প্রকৃত বিষয় হলো, পরবর্তী যুগের কিছু মানুষ এমন বানোয়াট ও মনগড়া কাহিনি কেবল নিজেদের পুস্তকেই স্থান দেয় নি বরং রসূল অবমাননার শাস্তির অধীনে দলিলরূপে উপস্থাপন করতে আরম্ভ করেছে। এটিকেই হাল আমলের মোল্লারা দলিলরূপে উপস্থাপন করে যে, রসূল অবমাননা যে ব্যক্তি করবে তাকে হত্যা করো অথচ রসূল অবমাননার এমন কোনো শাস্তির উল্লেখ ইসলামী শরিয়তে নেই আর এমন ঘটনার কোনো সত্যতাও নেই।

উদাহরণস্বরূপ, এঘটনা বিশ্লে ষণাত্মক দৃষ্টিতে দেখলে জানা যায়,প্রথমত সনদের দিক থেকে এই রেওয়ায়েত যয়ীফ এবং আল্লামা আলবানী এই হাদীসকে মওযূ আখ্যা দিয়েছেন। অতঃপর আল্লামা নাসির উদ্দীন আলবানী নিজ পুস্তক 'সিলসিলাতুল আহাদীস যয়ীফা ওয়াল মওযূ'-তে লিখেছেন, এর একজন রাবী হলো মুহাম্মদ বিন উমর ওয়াকিদি যে কি-না মিথ্যাবাদী আর ইবনে মুয়ীন তাকে যয়ীফ বলেছেন।

(সিলসিলাতুল আহাদীসিজ জায়িফাতু ওয়াল মওজুয়াহ, খণ্ড-১৩, পৃ: ৩৪-৩৫)

এছাড়া দিরায়াতের দিক থেকে দেখলে এই রেওয়ায়েত সম্পর্কে বেশ কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যেমন- সাহাবী অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও সেই মহিলার ঘরে একা কীভাবে পৌঁছালো? কেউ যদি বলে যে, রাস্তা পূর্বে দেখে থাকবেন কিংবা নিয়মিত যেতেন ফলে রাস্তা আঁচ করে পৌঁছে গিয়ে থাকবেন কিন্তু একান্ত রাতে একা সেখানে চলেও গেলেন, দরজায় পৌঁছে গেলেন, ভিতরেও গেলেন। তারপর দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, সেই মহিলাকে রাতের অন্ধকারে কীভাবে খুঁজে পেল। এটি কীভাবে বুঝতে পারল যে, আশপাশে তার বাচ্চারা ঘুমিয়ে আছে, প্রত্যেককে হাতড়ান আর এরপর বুঝতে পারেন অথচ ইত্যবসরে কেউ জেগে উঠল না। হাতড়াতে হাতড়াতে এটি বুঝতে পারল যে, সে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছিল। সেই নিহত মহিলা মৃত্যুকে সামনে দেখেও অন্ধের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা কিংবা আত্মরক্ষার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করল না অথচ রেওয়ায়েত অনুযায়ী হত্যাকারী দুধের শিশুকে জোর করে পৃথক করেছিল। তিনি নিজে অন্ধ ছিলেন আর সেই নারীর দৃষ্টিশক্তি ছিল। তবুও সে চিৎকার করে নি আর কোনো প্রতিরোধও করে নি। তার স্বামীও সেখানে শুয়ে ছিল, সেও জানতে পারল না। সবচেয়ে বড়ো বিষয় হলো, অন্ধ সাহাবী কারো শব্দ পাওয়া ছাড়াই কীভাবে বুঝতে পারলেন যে সেই মহিলাই মারওয়ানের কন্যা আসমা ছিল; সাধারণত অন্ধ ব্যক্তি শব্দের মাধ্যমে চিনতে পারে।

অন্য রেওয়ায়েতে ভিন্ন কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন কাহিনি রয়েছে। অন্য কাহিনিতে বর্ণিত হয়েছে, সেই মহিলা যখন খেজুর নিতে ভিতরে যান তখন সাহাবী এদিক-ওদিক তাকান কিন্তু কাউকে দেখতে পান নি। কিন্তু মনে রাখতে হবে,সাহাবী কিন্তু অন্ধ ছিলেন। তার জন্য এদিক-ওদিক তাকানো কীভাবে সম্ভব? কীভাবে বলতে পারেন যে, আমি এদিক-ওদিক খুঁজে দেখেছি কিন্তু কাউকে দেখতে পাই নি। বরং আগে থেকে পড়ে থাকা খেজুর দেখে বুঝেছে যে, সেগুলো ভালো মানের নয়। কেউ বলতে পারে স্পর্শ করে দেখেছেন। এটি মানলাম, প্রশ্ন হলো এদিক-ওদিক খুঁজে দেখার বিষয়টি তো মানা যায় না।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, সেই সাহাবী সেই নারীকে হত্যা করার পর যখন মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং হত্যা করার কথা জানানোর পর যখন পুনরায় সেখানে ফিরে যান তখন সেই নারীর ছেলে তাকে দাফন করছিল। এটিও ভাবার বিষয়। একদিকে সেই নারীকে হত্যা করে অন্যদিকে তার ছেলে কিছুক্ষণের মাঝেই দাফন করার জন্য চলে আসে। অল্প সময়ের ভিতর খুব দ্রুত সব কাজ হয়ে যাওয়া কীভাবে সম্ভব? এছাড়া আরো গবেষণা রয়েছে যা আমি আমাদের লোকদের জন্য বর্ণনা করে দিতে চাই। অন্যান্য স্ববিরোধ এই ঘটনার মিথ্যা ও বানোয়াট হওয়া প্রমাণ করে। এর মাঝে একটি হলো, অধিকাংশ রেওয়ায়েতে নারীর নাম মরওয়ানের কন্যা আসমাবর্ণিত হয়েছে। কিন্তু 'আল-ইসতিয়াব' গ্রন্থের লেখকের মতে, সেই মহিলার নাম আসমা ছিল না বরং উমায়েরের বোন বিনতে আদী ছিল।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব,৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯১)

দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ স্থানে হত্যাকারীর নাম উমায়ের বিন আদী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কতক স্থানেআমর বিন আদীও বর্ণিত হয়েছে।

(জোয়ামিউল সীরাত লি ইবনে হিজম, পৃ: ১৯)

ইবনে দোরায়েদের মতে হত্যাকারীর নাম গশমির ছিল।

(শারাহ যারকানি আলাল মোয়াহিবুল লাদানিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৪২)

অন্যান্য বর্ণনানুযায়ী উপরে বর্ণিত কেউ-ই হন্তারক ছিল না বরং সেই নারী যখন খেজুর বিক্রি করছিল তখন তার গোত্রের কেউ তাকে হত্যা করেছে।

(শারাহ যারকানি আলাল মোয়াহিবুল লাদানিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৪)

ইবনে সাদের মতে, মধ্যরাতে হত্যা করা হয়েছে। অন্যদিকে যুরকানির বর্ণনানুযায়ী দিনের বেলা অথবা সন্ধ্যার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়, কেননা রেওয়ায়েত অনুযায়ী সেই নিহত নারী তখন খেজুর বিক্রি করছিল।

(শারাহ যারকানি আলাল মোয়াহিবুল লাদানিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৪)
(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২১)

এছাড়া তাদের হত্যার পদ্ধতির বর্ণনাতেও মতবিরোধ রয়েছে। যেমন নিহত নারীকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে, তার পেটে খঞ্জর ঢুকিয়ে হত্যা করা হয়েছে, রাতে ঘুমের মাঝে হত্যা করা হয়েছে অথবা খেজুর ক্রয়ের বাহানায় তার ঘরে গিয়ে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে ইত্যাদি। এছাড়া সীরাত ইবনে হিশাম অনুসারে যখন আবু ইফক-কে হত্যা করা হয় তখন সে (সেই নারী) মুনাফিক হয়ে যায়। এ বাক্য থেকে এটিই মনে হয় যে, সে পূর্বে মুসলমান ছিল। কিন্তু আবু ইফক-এর হত্যার কথা শুনে সে মুনাফিক হয়ে যায়। পূর্বেই যদি সে মুসলমান হয়ে থাকত তাহলে সে কীভাবে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে অবমাননাকর কবিতা লিখত এবং মসজিদ অপবিত্র করত?

ওয়াকিদির রেওয়ায়েত অনুসারে উমায়ের বলেছিল, হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে মানত করছি। আমি যদি মহানবী (সা.)-এর সাথে মদীনায় ফেরত যাই তাহলে আমি অবশ্যই তাকে (মারওয়ানের কন্যা আসমা-কে) হত্যা করব কিন্তু মহানবী (সা.)-এর প্রসিদ্ধ জীবনী দায়রায়ে মাআরেফের লেখকের কথা অনুসারে সে অন্ধ হওয়ার কারণে বদরের যুদ্ধে অংশ নিতে পারে নি। আর সেই লেখকই এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে ওয়াকিদির উক্তি- তিনি অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন বলে উল্লেখ করেছেন।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) পৃ: ৪২-৪২৯](কিতাবুল মাগাযি লিল ওয়াকদি, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৬১)

নিজেরাই ভ্রান্ত রেওয়ায়েত নিয়ে সবকিছু গুলিয়ে ফেলে। এটি যদি মিথ্যা এবং বানোয়াট না-ই হয় তাহলে তারীখে তাবারী, ইবনে কাসীরের মতো

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 2-9 Nov, 2023 Issue No.44-45

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

১ম খুতবার শেষাংশ.....

হওয়ার পর তিনি একটি কট্টর ধর্মীয় পথ অবলম্বন করার মাধ্যমে চরমপন্থী মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। (টিভি) দেখা হারাম– একথা বলে ঘরের টিভিও বিক্রি করে দেনআর ঘরের সব ছবিও ছিঁড়ে ফেলেন, কেননা এটিও হারাম। তিনি একজন ভালো শিল্পী ছিলেন। কিন্তু কোনো মৌলভীর ছত্রছায়ায় থেকে তিনি যখন ধর্মের জ্ঞান লাভ করেন তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে ধর্মান্ধ হয়ে যান এবং সব ধরনের ছবি অঙ্কন করা থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু তার মনে এ সন্দেহ ছিল যে, আমি সঠিক কি–না, ইসলাম সত্য কি–না তা জানি না। তার একজন খ্রিষ্টান বন্ধু ছিল, কিছুকাল পর তিনি তার দ্বারা প্রভাবিত হন আর ইসলাম সম্পর্কে তার যে–সব সন্দেহ ও প্রশ্ন ছিল সেগুলোর উত্তর না পাওয়ার কারণে তিনি খ্রিষ্টান হয়ে যান। কিন্তু কিছুকাল পর মহানবী (সা.)–এর প্রতি ভালোবাসা উদ্‌বেলিত হলে আবারো তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। যাহোক, তিনি বেশ পরিশ্র মী ছিলেন এবং পড়াশোনার অভ্যাস ছিল। বসরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডিগ্রি লাভ করেন। সেখানকার কলেজ অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ইকোনমিক্সে পড়াশোনা করেন। তিনি ভাষা শেখার প্রতি অনুরাগী ছিলেন, তাই তিনি ভালোইংরেজী শিখেছিলেন, ফ্রেঞ্চ শিখেছিলেন, স্প্যানিশ শিখেছিলেন, জার্মান শিখেছিলেন এবং কিছুটা রাশিয়ান ভাষাও জানতেন। ২০০৯ সালে তিনি তার স্ত্র ীর সাথে এখানে যুক্তরাজ্যে চলে আসেন, তারপর আল্লাহ্ তা'লা তাকে একটি কন্যা সন্তানও দান করেন। যুক্তরাজ্যে আসার পর ফারাজ সাহেব হঠাৎ করেই এমটিএ আল–আরাবিয়া দেখতে পানআর এতে তিনি তার প্র শ্নের উত্তর পেতে শুরু করেন। অবশেষে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর সত্যতা তার হৃদয়ে এমনভাবে বাসা বাধে যে, প্রায় সময়ই মহানবী (সা.)–এর প্রশংসায় লেখা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর বিভিন্ন কাসীদা (আরবী কবিতা) গুনগুন করে গাইতেন। এরই মাঝে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) –কে স্বপ্নে দেখতে পান, তিনি একটি বড়ো শুভ্র মসজিদে বক্তৃতা করছেন এবং তাঁর বরকতময় চেহারা থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। পরে আবার এক সুদর্শন যুবককে দেখেন, যে একজন সাংবাদিকের মতো মাইক দিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–কে অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর নামে উল্লেখ করার মাধ্যমে লোকেদেরকে তাঁর অনুসরণ করার উপদেশ দিচ্ছে। পরিশেষে এর ভিত্তিতে তিনি ২০১২ সালে বয়আত করেন। তিনি শেফিল্ডের ডা. বিলাল তাহের সাহেবের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তার মাধ্যমে তিনি বয়আতের অবেদন প্রেরণ করেন। এরপর তাঁর সাথে সম্মিলিতভাবে তিনি জামা'তের বিভিন্ন বইপুস্তক ও প্রশ্নোত্তর অধ্যয়ন করেন এবং খুব শীঘ্রই তিনি জামা'তী মতবাদ ও বিশ্বাসের প্র চার এবং বিভিন্ন আপত্তির উত্তর দিতে আর জ্ঞানের ভিত্তিতে জামা'তকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করতে আরম্ভ করেন।

জর্ডান থেকে ইয়াজিন রাবাবা সাহেব লিখেন, প্রিয় ভাই ফারাজ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব খুব ভালো আহমদী ছিলেন। জামা'তী বইপত্র অধ্যয়ন করতেন। তিনি শত্রু ও মুরতাদদের জবাব দিতেন। তিনি সত্যিকার অর্থেই ইসলাম আহমাদীয়াতের একজন প্রতিরক্ষাকারী ছিলেন। ফেসবুকে আহমদী বন্ধুরা তাকে ফারেসে আহমদীয়াত, অর্থ াৎআহমদীয়াতের অশ্বারোহী যোদ্ধা বলত। তার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আমার চোখ অশ্রুসিক্ত। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন।

তামিম আবু দাক্কা সাহেব লিখেন, ফারাজ সাহেব একজন অসাধারণ গবেষক ছিলেন এবং আরবী ও ইংরেজীতে অনুবাদ এবং লেখার ক্ষেত্রে তার চমৎকার দক্ষতা ছিল। জামা'তের ওয়েবসাইটে প্রশ্নের উত্তরদাতা দলের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তার উত্তরগুলো সর্বদা সম্পূর্ণ এবং যুক্তিযুক্ত হতো, যার স্বপক্ষে তিনি জামা'তী ও জামা'তের বাইরের আরবী এবং ইংরেজী উদ্ধৃতি উপস্থাপন করতেন। কিছু আরব মুরতাদ ও মুনাফিক যখন ফিতনা ছড়াচ্ছিল তখন তাদের আপত্তির উত্তরদাতা এবং তাদের মোকাবিলাকারীদের মধ্যে তিনি প্রথম সারিতে ছিলেন। নিজের পরিপূর্ণ ঈমান ও ভালোবাসার কারণে জামা'ত ও খিলাফতকে তিনি দৃঢ়ভাবে রক্ষা করেছেন।

ডা. আয়মান ওদে সাহেব বলেন, মরহুম ভাই ফারাজ আব্দুল ওয়াহেদ তার বিস্তর জ্ঞান এবং ব্যতিক্রমী বুদ্ধিমত্তার জন্য বিশেষত তার বিভিন্ন প্রবন্ধ ও লেখার বরাতে পরিচিত ছিলেন। তিনি বেশিদিন আগে জামা'তভুক্ত হন নি, তথাপি তিনি খুব অল্প সময়ের মধ্যে জামা'তের মতাদর্শ ও বিশ্বাস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করে নিজ কার্যকর জবাবের মাধ্যমে বিরোধীদের মুখ বন্ধ করে দিতেন। কয়েক বছর পূর্বে মরহুমকে আমাদের আরবী ওয়েবসাইটে (উত্থাপিত) বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, যা তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে জীবনের নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিরলসভাবে পালন করেছেন। প্রশ্নোত্তরের আরবী ওয়েবসাইট 'বাসাতে আহমদী'–তে তাঁর প্র ায় ৮০০ নিবন্ধ বা আপত্তির উত্তর তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এবং জামা'তী মতবাদ–মতাদর্শ ও বিশ্বাসের প্রচার আর বিরোধীদের আপত্তির উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে নিষ্ঠার সাক্ষ্য বহন করবে।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন, মর্যাদা উন্নীত করুন আর তার স্ত্রী ও সন্তানদের সহায় হোন। তাদেরকে ধৈর্য ও সাহস দিন। পরিবার পরিজনের জন্য তার শুভ কামনা কবুল করুন। দোয়াগুলো গৃহীত হোক এবং জামা'তকে তার মতো আরো উত্তম বিকল্প লোক দান করুন। যেভাবে আমি বলেছি, নামাযের পর জানাযার নামায পড়ব, ইনশাআল্লাহ্ ।

****

২য় খুতবার শেষাংশ.....

প্রসিদ্ধ ইতিহাস ও সীরাতের গ্রন্থ কেন এই ঘটনা বর্ণনা করে নি। কেবল কয়েকটি গ্রন্থ যেমন- তাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ প্রভৃতি গ্রন্থ ভাসাভাসা এটি উল্লেখ করেছে। আবার অনেক গ্রন্থ এই ঘটনার আদৌ উল্লেখই করে নি। তবে ওয়াকিদি এই ঘটনাকে কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসের গ্রন্থাবলীতেও এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় না অথচ হাদীস গ্রন্থের প্রণেতারা সেসব রেওয়ায়েত নিজেদের গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন যা মহানবী (সা.)-এর প্রতি আরোপ করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো এই ঘটনার উল্লেখ কেন করা হয় নি? অতঃপর এই রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.) যখন স্বয়ং সেই সাহাবীকে এই নারীর হত্যার জন্য প্রেরণ করেছিলেন তাহলে সেই সাহাবীর আবার মহানবী (সা.)-কে এ বিষয়টি জিজ্ঞেস করার কী কারণ থাকতে পারে যে, তাকে হত্যা করায় আমার কোনো পাপ হবে না তো? যেভাবে আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি।

এই ঘটনা যদি সত্যই ঘটে থাকত তাহলে ইহুদীরা নিশ্চিতভাবে এটি বলত যে, মুসলমানরা প্রথমে মারওয়ানের কন্যা আসমাকে হত্যা করে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে আর মদীনার শান্তি বিঘ্নিত করতে চেয়েছে। অথচ ঐতিহাসিক যেমন আর-রওদুল উনফ এবং তবরীর ইতিহাস একমত যে, মুসলমান এবং ইহুদীদের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ হলো বনু কায়নুকার যুদ্ধ।

(আর রউজুল উনাফ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২২৫) (তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৮)

ইহুদীদের কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় নি। তাই এ বিষয়গুলো এ ঘটনাকে সন্দেহযুক্ত বরং মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। কট্টোরপন্থী মোল্লারা এসব ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে ইসলামের অতুলনীয় সুন্দর শিক্ষাকে দুর্নাম করছে আর বর্তমানে এমনই মনগড়া কাহিনির ওপর ভিত্তি করে তারা আহমদীদের বিরুদ্ধেও উগ্রতা প্রদর্শন করে বেড়ায় আর মৌলভী অন্যান্যদেরকে উসকিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় ঘটনাও এর সাথে সামঞ্জস্য রাখে, সেটি ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করব, সেটিও যে মিথ্যা ঘটনা তা -ও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

১ম পাতার শেষাংশ..... **********

হবে তাদেরকে পরানো হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় হযরত উমর (রা.)কে রসুলুল্লাহ্ (সা.) একটি রেশমি চাদর দিলে তিনি বলেন, হে রসুলুল্লাহ! আপনি এটা আমাকে কিভাবে দিলেন? পুরুষদের জন্য তো রেশমী বস্ত্র পরিধান নিষিদ্ধ। আঁ হযরত (সা.) বললেন, তুমি এটা তোমার স্ত্রীকে পরার জন্য দিতে পার।

نِعْمَ الثَّوَابُ ۖ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا অর্থাৎ কুরআন করীমের প্রতি ঈমান আনয়নকারীদেরকে যে পুরস্কার দেওয়া হবে সেগুলি ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে না,বরং এর পরিণামে শান্তি লাভ হবে। আর حَسُنَتْ مُرْتَفَقًا দ্বারা বলা হয়েছে যে, কুরআনীয় শিক্ষা অনুসরণ করে যে সব সখ্যতা ও বন্ধুত্ব তৈরী হবে সেগুলি যেহেতু নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, এর পিছনে কোন ব্যক্তিস্বার্থ অন্তর্নিহিত থাকবে না,তাই সেই সব সখ্যতার কারণে কোন ঝগড়া বিবাদ হবে না, বরং শান্তি লাভ হভে।

(তফসীরে কবীর, ৪থ খণ্ড, পৃ:৪৪৬)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir